নমিতা চক্রবর্তী

'ইন্দ্রনীলা' প্রথমে 'বসুধারা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত গ্রন্থে দু'টি সম্পূর্ণ নূতন পরিচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে।

নমিতা চক্রবর্তী

॥ এক ॥

বেলস্‌ পার্কের পাশ দিয়ে, ঝিলের পাড় ঘেঁষে সোজা চলে গেছে লাল-টুকটুকে ইটের রাস্তা চাঁদমারির দিকে। চাঁদমারি মস্তবড় মাটির পাহাড়। সৈন্যরা সেখানে বন্দুক ছুঁড়বার নিশানা অভ্যাস করে। লোকালয়ের ঘনতা ছাড়িয়ে, অনেকটা জায়গা নিয়ে মিশনেব বাড়ী। লম্বা টানা টিন-ছাওয়া, সিমেণ্ট আর বেড়ায় মেলানো সাত-আট কামরাতে বিভক্ত ঘর। এটা পাঠশালা। আবও খানিকটা গিয়ে দোতলা সুন্দর সাদা বড় বড় দুটো বাড়ী। মাঝখানে উঁচু দেয়াল। একতলায় ছেলে মেয়েদের ইস্কুল, দোতলায় বোর্ডিং। দশজন ছেলে আর পঁচিশজন মেয়ে বোর্ডার আছে। ছেলে-ইস্কুলের হেডমাস্টার আরভিং সাহেব থাকেন তাঁর কোয়ার্টারে। মেয়েদের হেডটিচারের আলাদা বাড়ী নেই। রুথদি থাকে বোর্ডিং -এরই, একটি আলাদা ঘরে। মামণি—মাদার জেনের অবশ্য আলাদা বাড়ী আছে। গোল গোল থাম-ঘেরা গির্জা-বাড়ী সেটা। ইস্কুল-বাড়ী, বোর্ডিং, গির্জাঘর—সবার কর্তা ফাদার স্ট্রং। তিনি বেশীর ভাগ সময় পাড়াগাঁয়ের মিশনগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন, সদরে এলে, থাকেন গির্জা-বাড়ীর বড় কামরায়। তখন সেখানে কত লোকের ভিড়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পর্যন্ত তখন রবিবারে চার্চে আসেন। তাঁর মেমসাহেব রবিবারে কেক পাঠান বোর্ডিং-এর ছেলে-মেয়েদের। বড়দিনে 'খ্রীষ্টমাস বৃক্ষ' সাজাবার সব জিনিসই তো আসে মেমসাহেবের কাছ থেকে। ফাদার-খ্রীষ্টমাস সেজে উপহার বিলিয়ে দেন ছোট ফাদার জন সাহেব।

পাঠশালায় পড়ায় রমেশ মাস্টার। আগে সে নাকি জাতিতে

ছিল নাপিত। হিন্দুরা মিশনের পাঠশালাকে নাপতা পণ্ডিতের পাঠশালা বলে বটে, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের পাঠাতেও ছাড়ে না। মাত্র দু'আনা বেতন দিয়ে কি বাণীপীঠ ইস্কুলে পড়ানো যায়? প্রথম তিন ঘণ্টাতে পাঠশালায় নামতা, অঙ্ক আর বাংলা হয়। রমেশ স্যার বাংলা আর অঙ্ক করায়। পাঠশালায় ছাত্রছাত্রী দুই-ই আছে। সবচেয়ে বড় ছাত্রী কোহিনূর। তার বয়স এগারো। ইস্কুলের মদন চাপরাসীর মেয়ে সে। টিফিনের পর কোহিনূরের তত্ত্বাবধানে দেয়াল-ফুটো-করা দরজা পেরিয়ে মেয়ে-ইস্কুলের কাছের সেই গির্জাঘরে মেয়েরা বাইবেল-ক্লাস করতে যায়। হিন্দু মেয়েরাও করে বাইবেল-ক্লাস। মাথায় ছোট ছোট শাড়ির আঁচল কিংবা হাত চাপা দিয়ে গুণ্ঠন রচনা করে মেয়েরা গান ধরে—

"আমরা প্রভুর ছোট মেষ—
মোদের ভালোবাসেন বেশ।"

তারপর 'মথিলিখিত সুসমাচার' আর 'দশ আজ্ঞা' থেকে ধর্মকথা শুনে সদাপ্রভুর মেষশাবকদল বাড়ী ফিরে যায়। মিশনের চৌহদ্দি পেরিয়ে, বড়রাস্তার দুপাশে বকুলগাছ। তলায় ঝরে পাকা বকুল টুপ্‌টাপ্, তাই মুখে ফেলে স্লেট বই হাতে মেয়েরা চলে যায় যে-যার বাড়ী।

ছেলেদের ছুটী এত সহজে হয় না। টিফিনের পর তাদের ইংরেজী পড়াতে আসেন তপনবাবু। বড় ইস্কুলের দ্বিতীয় স্যার। তপনবাবু খ্রীষ্টান নন। হিন্দু, ব্রাহ্মণ। টকটকে গৌর বরণ। সবল দীর্ঘ দেহ। বর্ষার মেঘের মতো কণ্ঠস্বর। চোখে কিন্তু তাঁর বিদ্যুতের ঝলক নেই, বরং বর্ষার সজল ছায়া আর ঝিরঝিরে হাসি। দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করেছেন। কেন যে মিশন-ইস্কুলের মাস্টার হয়েছেন, বোঝা শক্ত। সবাই বলে—ঐ-যে টেনিস খেলা, আর সাহেবদের ক্লাবে গিয়ে হাত-নাড়ানাড়ি,—আতেই সব ভুল হয়ে গেছে তপনের। ভবিষ্যতের ভাবনা

ভাবছেই না। আগুাঘর—ইয়োরোপীয়ানদের ক্লাবে তপন স্থায়ী সভ্য। টেনিস-টুর্নামেণ্টে জেতা মালা গলায় বড় ছবি আছে বাড়ীতে।

তপন কেবল ছেলেদের ইংরেজী পড়ায় না। হরিশের বাবা নিবারণ মিস্ত্রীর জ্বর ছেড়েছে কিনা খোঁজ নেয়, নিটুল হাতুই, জোহান কুর্মকে বই আর প্যাণ্ট কিনে দেবার জন্য চকবাজারে নিয়ে যায়। আরো কত কি যে করে কে তার খোঁজ রাখে! তপন যখন রাস্তায় চলে—মেয়ে-ইস্কুলের মাঠে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বোর্ডিং-এর সব মেয়েরাই খ্রীষ্টান। তাদের মায়েরা ঘর লেপতো, রাজমিস্ত্রীর ইট বইতো আর নালায় কুঁচো মাছ ধরে কিংবা পড়শিনীর মাথার উকুন বেছে অবসর বিনোদন করতো। পিতৃ-পরিচয় আরো নগণ্য। মিশনারীরা এদের আলোয় এনেছেন সত্যি সত্যি। এখন পুরুষরা ডকে কিংবা মিশনে চাকরী করে, মেয়েরা আয়া, ঝি, দাই বা নার্স। রবিবারে তারা ফরসা কাপড় প'রে গির্জা-বাড়ী যায়। শপথ, গালাগালি প্রায় বন্ধ। তাদের মেয়েরা কুঁচি দিয়ে পিন এটে শাড়ি পরে, শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। সবাই পড়াশুনায় ভালো। দুহিতাদের দেখে তাদের বাপ-মায়ের ইতিহাস বিন্দুমাত্রও অনুমান করা যায়না।

পাঠশালা ও ইস্কুলের হিন্দুমুসলমান সব ছাত্রই ফাদার স্ট্রংকে বড় ভালবাসে। ফাদার পরিষ্কার বাংলা বলেন। সবার জন্য তাঁর দাক্ষিণ্য সমপরিমাণে বিতরিত হয়।

'পাপীর জন্য সদা প্রভু' এ-কথা তাঁর কখনো বিস্মরণ হয় না। ফাদারের সহৃদয়তা সম্বন্ধে কত গল্প আছে—সে-গল্প যে সব মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পরমেশ দপ্তরী।

অনেক আগে গভীর রাতে মিশনে এসেছিল চোর। তাড়া খেয়ে ঝাঁপ দিলো পুকুরে। আর যাবে কোথায়! সবাই পুকুরের

চারপাশ ঘিরে আস্ফালন করছে। বন্দুক দেখাচ্ছে মিশনের ওয়াচার, এমন সময় শোনা গেল ফাদারের গলা—'তস্কর, তুমি উঠিয়া আইস।'

তস্কর ফাদারকে ভালোই চিনতো, কেঁদে বললো--'ফাদার, মোর পৈরনে বস্তর নাই।'

ফাদারের আদেশে সবাই সরে গেলে চোর উঠে এসে সাহেবের পায়ে পড়লো। পরবর্তীকালে পরমেশের চেয়ে বিশ্বাসী দপ্তরী মিশনে একটিও দেখা যায়নি।

॥ ছুই ॥

দোতলায় রুথ তার ঘরে বসেছিল। রং ফরসা, অনিন্দ্য দেহবল্লরী। চোখের সুনীল তারা আর চুলের লালচে রং রক্তে পাশ্চাত্ত্য মিশ্রণের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ছ'বছর আগে সে আই. এ. পাস করেছে। রুথ মিশন-স্কুলের ছাত্রী। সপ্তম শ্রেণীর পড়া এখানে শেষ করে তিন বছরের জন্য গিয়েছিল সদর বালিকা-বিদ্যালয়ে। তারপর প্রবেশিকা পাস ক'রে কলকাতার ডায়োসেসন কলেজে পড়তে গিয়েছিল। আই. এ. পাস ক'রে ফিরে এসেছে নিজের সহরে। জেনানা মিশনের মাদার জেন রুথকে মেয়ে-ইস্কুলের বড় দিদি করে দিয়েছেন।

রুথের মা ধাত্রী, বাপ নাকি ছিল পাগল। তাকে রুথ কখনো দেখেইনি। শুনেছে সে যখন মাতৃগর্ভে, তখন অনন্ত পুঁই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। রুথের মা কনক ধাই রূপসী নয়, কিন্তু ধাত্রীর কাজে তাঁর তুলনা মেলে না। পোয়াতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়। সহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার ভুবনবাবু ঘরে বসে আছেন। তাঁর কপাল ঘামছে। একটু আগে দেখে এসেছেন প্রসূতিকে, —অপারেশন কিংবা একজনের মৃত্যু ছাড়া উপায় নেই। এখন কনক ধাইয়ের পালা। শাশুড়ী ঠাকুর-ঘরে আছড়ে পড়েছেন। বড় সাধের বউয়ের প্রথম সন্তান আসছে, মস্ত বিপদ তার আসার পথে। আধঘন্টা একঘণ্টায় দাঁড়ালো। ভুবনবাবু অসহিষ্ণু। বাড়ীর ছেলেরা আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়। হঠাৎ ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ হলো।

—'হয়েছে? হয়ে গেছে? বৌ কেমন? কি? ছেলে?'…

সাবান-ফেনায় হাত রগড়ে, গরদের শাড়ির অঙ্গীকার আর নগদ পঞ্চাশ টাকা নিয়ে কনক গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। কোচম্যান জব্বরউল্লা—'হেইও—টক্ টক্'—ঘোড়ায় চাবুক মারলো।

সবাই বলে কনকের হাত যাদু জানে। সৃষ্টিকর্তার দুর্গ-রহস্যের ভেদমন্ত্র তার দুই হাতের দশ আঙুলে। খ্যাতি অখ্যাতি দুই-ই ছিল কনকের। টাকা ছাড়া সে 'রা'-টিও খসাতো না, আবার তার হাতে পো-পোয়াতির অনিষ্ট হয়েছে এমন কথা দশ বছরের মধ্যে কেউ শোনেনি। টাকার অভাব কনকের ছিল না। লেখাপড়া, গান-বাজনা, ছবি আঁকা—সবকিছুতেই রুথ যে এমন পারঙ্গম হয়ে উঠেছিল তার মূলে কনকের অকুণ্ঠিত অর্থব্যয়। রুথ সুন্দরী, শিক্ষিতা, বহুগুণে গুণবতী। আদর তাব খ্রীষ্টান সমাজ ছাড়িয়েও বহুদূর বিস্তৃত। কিন্তু এমন মেয়ের বর জুটছে না। রুথের বয়স যখন দশ, তখন হতেই তাকে উদ্দেশ্য করে কোনো কোনো ছেলে কবিতা লিখেছে। চিঠি রেখেছে রুথের বাড়ী ফেরার পথের ধারে। অনুরোধ করেছে তিনবার হাততালির শব্দ পেলে জানালায় দাঁড়াতে। এমন রুথ যখন উনিশ বছরের হলো, তখনো কিন্তু তার মালা নেবার জন্য কেউ এলো না। কেন আসবে? কনক ছোটবেলায় কোথায় থাকতো? কে জমিদার ডি'সিলভার ছেলের আয়া ছিল? ডি'সিলভার পিয়ন অনন্ত পুঁইয়ের সঙ্গে কনকের বিয়ে দিল কে? কে কনককে দাইগিরি পড়ালো? আর অনন্ত পুঁই ঝাঁপ দিলো কেন নদীতে? এই মর্মান্তিক জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর অপরপক্ষ রুথের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করতো। সুতরাং কনক মেয়ের বিয়ে দিতে পারলো না। তখন যে-মেয়ে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলে তার মতো আত্মবিশ্বাস নিয়ে কনক মেয়ের দিকে তাকালো, তার শিক্ষায় মন দিল। রুথ মাদারের প্রিয়পাত্রী ছিল, নতুন জ্ঞানের

জগৎ তিনি তার কাছে খুলে দিলেন। এখানে জীবন ধর্ম ও সংযমে উজ্জ্বল, শিল্প ও সাহিত্যে সমৃদ্ধ। •জ্ঞানের আনন্দ তাকে মাত্র ছুঁয়েছে, অন্য কিছুই সে ভাবতে পারছিল না।

কনকের কিন্তু মেয়ের এ-জীবনও আর ভালো লাগছিল না। সে ভাবছিল জমিদার রাজামিঞার কথা। রাজামিঞার বয়স হয়েছে সত্য, কিন্তু তার বহু ধন। দুই বিবি দামী মটরগাড়ীর জানালায় পর্দা ঝুলিয়ে নদীর পাড়ে হাওয়া খেতে যায়। কনকে-রতনে-পেশোয়াজে তাদের স্বর্গের অপ্সরী বলে ভুল হয়। কনকের বাড়ীর মতো ঘরে রাজামিঞার বাঁদীরা থাকে। তাদেরি বা রূপ কত! বড়বেগম জুমেলা বুড়ী হয়ে গেছে, বাচ্চা-কাচ্চা আর হবে না। ছোটবেগম হালিমার বয়স কম, কিন্তু তারও তো সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূর হয়ে আসছে। একদিন হিঁদু-জল-অচল জাত ছিল কনকের বাবার। ফাদারের দয়ায় এমন সমাজে এলো, যেখানে অন্তত মানুষের ছোঁয়া লাগলে মানুষ তৃষ্ণার জল ফেলে দেয় না। তারপর মুসলমান? তাই-বা মন্দ কি! প্রকাণ্ড প্রাসাদ, জমিদারী,—সবই রুথের পায়ে অঞ্জলি দেবে রাজামিঞা। বিলেত নিয়ে যাবে, কেবল পাতলা নেটের অবগুণ্ঠনটুকু রাখতে হবে এই এক চুক্তি। রাজামিঞা বহুবার দেখেছে রুথকে। দেখেছে ঝিলের ঘাটে, অশোকফুল-ছাওয়া নদীর পাড়ে, দেখেছে বেলস্ পার্কে অনুষ্ঠিত বার্ষিক খেলার উৎসবে। কনক অনেকবার রাজামিঞার নিমন্ত্রণ পেলো। প্রতিশ্রুতিতে ভরে দিলো রাজমিঞা তাকে। কনকের মন লোলুপ হলো, লোভাতুর হলো। কনক বুঝলো, কিন্তু রুথকে বোঝায় কে? রুথ শুনে হাসলো—'পাগল নাকি?'

—'কেন? পাগল কেন? এত ধন ঐশ্বর্য, মান সম্মান! লাটসাহেব সহরে এলে প্রথম কার্ড পায় রাজামিঞা। শুধু কি ধন? বিলাত যায়নি ছ-সাত বার? ঘোড়ায় চড়তে জানে। যুবো-বয়সে ভালো টেনিস খেলতো।'

রুথ এবার আর হাসলো না। জিজ্ঞেস করলো—'অর্থের জন্য ধর্ম ছাড়বে ?'

এবার হাসলো কনক। ধর্ম! সে কি জাত-খ্রীষ্টান ? নিজের ধর্ম ছেড়ে রুথের বাপ খ্রীষ্টান হয়নি ?

বাপ !!—রুথ চোখ তুলে তাকালো কনকের দিকে, তারপর নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

কোথায় গেলো ? মিশনে। স্কুল-বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করে নিলো। বললো বাড়ীতে পড়াশুনার অসুবিধে, আর বোর্ডার মেয়েদের সঙ্গে থাকাই উচিত। ফাদার স্ট্রং সন্তুষ্ট হলেন।

জীবনে প্রথম আঘাত পেলো কনক। যে মেয়ে ছাড়া কাউকে কোনোদিন ভালবাসেনি সে—সেই মেয়ে তাকে ছেড়ে গেলো, অপমান করলো। জীবনে মাধুর্য কাকে বলে জানতো না কনক, তাই অভিমানের বদলে রুথের উপব হলো তাব প্রচণ্ড রাগ। রুথ বোর্ডিং-বাড়ী যাবার একবছরের মধ্যে কনক স্টীমাব কোম্পানীর ক্লার্ক জোসেফ পালকে বিয়ে করে ফেললো। কনকের বয়স তখন আটত্রিশ আর জোসেফ বিয়াল্লিশ বছরের বিপত্নীক দেশীয় খ্রীষ্টান।

কনক কোনোদিনও বিয়ে করবার কথা ভাবেনি। তাব বাপ খ্রীষ্টান হবার পর বারো বছর বয়সে সে জমিদার ডি'সিলভার বাড়ী ঢোকে। প্রথমে তার কাজ ছিল বাড়ীর আসবাবপত্র ঝাড়া। তারপর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ডি'সিলভার বেবীকে রাখবার ভার পেলো। বড় আয়া মিরিয়ামই উইলি-বাবাকে দেখাশোনা করতো, কনক কেবল গাড়ী ঠেলে তাকে নিয়ে সকালে বিকালে বেড়াতো। প্রচুর খাদ্য আর চিন্তাহীন বিশ্রামে কনকের দেহ বড় বেশী তাড়াতাড়ি যেন যৌবন-উদ্ধত হয়ে উঠলো। ডি'সিলভার নজর পড়লো কনকের পরিপুষ্ট দেহের প্রতি।

রুথ যখন পাঁচমাস গর্ভে, তখন সাহেব তাঁর চাপরাসী অনন্ত পুঁইয়ের সঙ্গে কনকের বিয়ে দিলেন। অনন্ত প্রথমে কি বিয়ে

করতে রাজী হয়েছিল? হয়নি। তারপর কিন্তু সাহেবের লাল চোখ আর বন্দুক দেখে সম্মতি দিতেও দেরী করেনি।

বিয়ের ঠিক একমাস পরে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে অনন্ত মরলো।

তারপর সাহেব তার অনেক করেছেন। রুথ হবার পর কলকাতা পাঠিয়ে দাইগিরি পাস করিয়ে এনেছেন; আর এখন কনকের মতো ধাই এ-সহরে আছে নাকি? এমন লোকের মেয়ে রুথ এত নিষ্ঠুর হবে কনক কখনো ভাবেনি। উঃ সাহেব কী মদই খেতেন! কখনো তাকে একটা কড়া কথা বলেননি। এমনকি মেমসাহেবও কখনো রাগ করেননি। মেমসাহেব! এটাই অবাক লাগে কনকের। তিনি কি করে সহ্য করতেন—দু'বছর ধরে সহ্য করেছিলেন কনককে? কেবল যখন তাকে কাছে ডেকে ইংরেজীতে কী বলতে বলতে মেমসাহেব হেসে গড়িয়ে যেতেন, আর সাহেবও থেকে থেকে—'ইউ নটি, সুইট গার্ল'—বলে হাসতেন তখনি যা একটু খারাপ লাগতো কনকের।

মাত্র পাস করে কনক সহরে এসেছে। তখন আশ্বিন মাস সাহেব মেম গেছেন জমিদারীতে—পাড়াগাঁয়। প্রতীক্ষায় আছে কনক। রুথ তখন দু'বছরের। হঠাৎ একদিন ঝড় উঠলো। সেকি ঝড়! সমস্ত দেশকে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে রেখে গেলো। কনক শুনলো কালাবদর নদে বোট ডুবে সাহেব মেম মরেছেন। খবর শুনে কনকের বুক ফেটে গেল। কি করে সে! কোথায় যায়! অকূল সমুদ্র। বাপ নেই, মা নেই, সমাজে নেই স্বীকৃতি, ঘাড়ে দু'বছরের সাদালোকের বাচ্চা। এনন সময় ফাদার কনককে ডেকে পাঠালেন। ডি'সিলভা তাঁর উইলে কনককে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন, সর্ত—রুথকে ভালো করে মানুষ করতে হবে। শুনে সমাজের কোঁচকানো ভ্রূ আরো কুঁচকে গেলো। সমাজ উপায়হীনাকে তবু দয়া করে, কিন্তু ধনবতীর ক্ষমা নেই। কনক

কিন্তু সেই ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করলো না। ঝিলের ধারে বাড়ী ক'রে, ব্যবসা স্বরু করে দিলো। সঙ্গে-সঙ্গেই লক্ষ্মী এসে ঘরে অধিষ্ঠিতা হলেন। অবশ্য খ্রীষ্টানদের মা-লক্ষ্মীকে মানা উচিত নয়--কিন্তু মনের কথা কেইবা আর শুনতে আসছে?

যাক্‌গে পুরানো কথা। এখন, রাজামিঞার কত টাকা, কত খাতির। কত সম্ভাবনা ছিল, দিলো মেয়েটা সব নষ্ট করে। আর দিনও তো শেষবেলায় এসে যাচ্ছে কনকের,—তবু এই প্রৌঢ় বয়সে প্রথম ঘর বাঁধার স্বাদ পেলো সে। সন্ধ্যার সময় এখন আর পারতপক্ষে 'কল' নিতে রাজী হয়না কনক। জোসেফ তখন বাড়ী আসে। এসে, সাবান মেখে ঝিলের জলে হুসহুস করে স্নান করে। সাফ পা-জামা আর গেঞ্জি প'রে চা খেতে বসে জোসেফ। তার সারা গায়ে সুগন্ধ, চোখে মুখে হাসি। কনকের মুখে জোর করে বিস্কুট পুরে দেয়। কনকের বুকের মধ্যে কিরকম করতে থাকে। তার জীবনে অনন্ত পুঁই ছিল দুর্ঘটনা আর ডি'সিলভা ছিল সাইক্লোন। জোসেফ কনকের ঘরকে করে দিলো সেইসব রূপকথার মুল্লুক, যেখানে স্বামী স্ত্রীর জন্য উৎকণ্ঠ ব্যগ্রতায় অপেক্ষা করে, শাশুড়ী-ননদ-জায়ে মিলে স্নেহ আর সেবার জোগান দেয়। এই স্বর্গের দেখা কনক হামেসাই পেতো তার হিন্দু পেসেণ্টদের বাড়ী। কিন্তু এতসব কিছুই বুঝতো না আগে। আজ তার সুখের সীমা নেই বলেই স্বচ্ছন্দে মনে হতে পারতো যদি রুথ এমন দাগা দিয়ে চলে না যেতো।

রুথ কিন্তু একেবারে চলে গেলো না। রবিবারে চার্চের পর মায়ের কাছে আসতো। রবিবার কনকের বড় সুখের দিন। সেদিন জোসেফ ফরসা সার্ট আর পাতলুন প'রে তাকে নিয়ে গির্জেয় যায়। ফাদারের প্রার্থনা কি সুন্দর! তিনি সেই ঈশ্বরপুত্রের কথা বলেন— যিনি মানুষকে প্রেম করেছিলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হয়েও অত্যাচারীর জন্য

স্বর্গীয় পিতার কাছ হতে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। সেই প্রভুকে সেবা দেবার পুণ্যেই তো কনক এতদিনে শান্তি পেলো। প্রার্থনার পর রুথকে নিয়ে কনক বাড়ী আসে। প্রথম প্রথম রুথ যখন আসেনি, কনকের বড় দুঃখের দিন গেছে। চার্চে না গিয়ে উপায় ছিল না। ফাদার তাহলে খুব রাগ করবেন। কিন্তু রুথের দিকে কনক চাইতেও পারতো না। রাগে আর ভয়ে তার মন অবসন্ন হয়ে গিয়েছিল বলেই না জোসেফের প্রস্তাবে মত দিয়েছিল সে। না হলে কনক কি আর বোঝেনি যে এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে বসার কোনো মানেই হয়না।

বিয়ের প্রায় তিন মাস পরে রুথ এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করলো। লজ্জায় কনক মেয়ের দিকে চাইতে পারছিলো না, রুথ কিন্তু দিব্যি হাসিমুখে কথাবার্তা বলছিল। তারপর রুথের আসা সহজ হয়ে গেলো। জোসেফের সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠতা হলো। তবে একটা ব্যাপার কনকের মনে লাগে। রুথ জোসেফকে 'পা' বলেনা, ডাকে 'মিস্টার পাল'।

ররিবারে জোসেফ আলেকান্দার ঠাকুর-মশাইয়ের দোকান থেকে বড় বড় রসগোল্লা আনে। কনকের রাঁধুনী কুসুমের মা মুরগীর ঝোল, মাছভাজা আর গরম গরম ভাত রেঁধে দেয়। ধবধবে চাদরপাতা টেবিলে তারা খেতে বসে। টেবিলের মাঝখানে যে মস্তবড় ফুলের তোড়াটা থাকে, সেটা রুথের আনা। স্কুল-বাড়ীর বাগান হতে ফুল তুলে মালী বেঁধে দিয়েছে। খাবার পরে পাশের ঘরে গিয়ে জোসেফ সিগারেট খায়, কনক সেলাই নিয়ে বসে, আর রুথ হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাইবেলের দু'একটা গান গায়।

তারপর রোদের ঝকঝকে তাজা ভাবটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসতেই লাল ছাতাটি মেলে রুথ ফিরে যায় তার বোর্ডিং-বাড়ীতে। সঙ্গে-সঙ্গেই কনকের দিনটা কেমন যেন জোলো বিস্বাদ হয়ে উঠতে

থাকে। জোসেফের নাকের ডাক আর বেড়ালটার ঘড়্ঘড়্ এক হয়ে যায়। কুসুমের মায়ের দুঃখী মুখটা ভেঙেচুরে চ্যাপ্টা হয়ে ঘুমিয়ে থাকে। কনক চালাক মানুষ। সে জানে একবার মন খারাপ হতে দিলে আর রক্ষে নেই। একেবারে শেষ হয়ে যাবে সে। তাই কনক উঠে পড়ে। শাড়িটা বদলে, চুলে চিরুনি বুলিয়ে হিঁদুপাড়ার দিকে পা চালিয়ে দেয় সে। সেখানে তার আদর খুব। হিন্দু মেয়েরা হাসপাতালে যায় না। সম্বল তাদের খোট্টা দাই। তারা মেথরানীর কাজ করে, আবার এ-সময়ে মেয়েদের সাহায্যও করতে আসে। নগদ পাঁচসিকে আর একখানা যেমন-তেমন শাড়ি পেলেই খুসী। তাদের লম্বা লম্বা নখে থাকে মৃত্যুর বীজ। হ্যাঁচকা টানে তারা আগন্তুককে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। জানিয়ে দেয় ছেলে কি মেয়ে হলো। বাড়ীতে নিয়ম বুঝে জোকার পড়ে। তারপর শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী সুধোন—'ও লছমী! বলি—ও রাধিয়া! কান্হাইয়ের মা! কচিটা কাঁদেনা কেন? বউ কেমন গো?'

লছমীরা উত্তর দেয়—'বহু তো ভালাই, লেকিন বাচ্চাটা তো ভারি দুবলা ছিল.—সিটার তো হয়ে গেছে।'

প্রসূতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দুর্বল কণ্ঠে কাঁদে। গুরুজনেরা সান্ত্বনা দেন- –'কেঁদোনা মা, কেঁদোনা! সব ফল কি গাছে থাকে? গাছ বাঁচলে আশ। ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে পড়। বছর না ঘুরতে আবার কোলজোড়া হবে।

তারপর নি-রোজগেরে আত্মীয় দিয়ে মৃত শাবকটিকে পাঠিয়ে দেন সেই নদীর পাড়ে।

—'ভালো করে পুঁতে রেখো, বাছা। কাকে-চিলে যেন টানাটানি না করে।'

ব্যস, মিটে যায় মা হবার হাঙ্গামা। একমাস না পুরতেই বধূ লেগে যায় সংসারের কাজে, স্বামীর তুষ্টিসাধনে। কোলে কাঁখে

থাকলে খানিকটা সময় নষ্ট হতো বইকি। বোশেখ মাসে ননদের বিয়েতে কি অমন গতর দিতে পারতো সংসারে ?

তবে সব সময়েই যে এমনটা হয়, তা নয়। উল্টোও ঘটে। পো-র বদলে পোয়াতি যায়। আবার দুই-ই বেঁচে থাকে কখনো কখনো। কনকের হাতে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তাইতো অল্পবয়সী বউ আর সচ্ছল ঘরের গিন্নীদের নজর তার উপর। তবে বড্ড খাঁকতি কনক ধাইয়ের। নগদ কুড়ি টাকার কম নেবেনা। কিন্তু হ্যাঁ, যত্নটা করে বটে! পো-পোয়াতি দু-ঠাঁই হবার পরও চলে যায় না। যতদিন না নেয়ে-ধুয়ে ঘরে উঠছে, কনকের আসবার বিরাম নেই। কিন্তু এত টাকা খরচ কি বছর বছর করা সোজা কথা, না সবাই করতে পারে? ছা-পোষা সংসারে হুট করে কুড়িটা টাকা বার করা তো সম্ভব নয় সব সময়।

কনকের বাঁধা ঘর আছে অনেকগুলি। জমিদার বাড়ী, দত্ত-বাড়ী, উকিলবাবু—আরো অনেকেই, যাঁরা পুরুষ ডাক্তার পছন্দ করেন না, তাঁরা কনকের মক্কেল।

॥ তিন ॥

মায়ের কাছ হতে রুথ আজ একটু বেশী আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। রোদটা বড় লেগেছে। বোর্ডিং এর ঝি ফুলমণিকে একগ্লাস খাবার জল আনতে বলে রুথ চেয়ারে বসে ভাবছিল আগা[illegible] [illegible] সরস্বতী আসবে কিনা। অনেকদিন ধরে সরস্বতী [illegible]লে অনুপস্থিত। একমাস পরে বৃত্তি পরীক্ষা। সরস্বতী পড়াশুনায় ভালো। বুদ্ধি আছে, বৃত্তি পাবে নিশ্চয়—কিন্তু হিন্দু মেয়ে। হয়তো দুম করে খবর আসবে তার বিয়ে হয়ে গেছে। মুশকিল এসব মেয়েদের নিয়ে। ফুলমণি রুথের হাতে জলের গ্লাস দিয়ে বললো—'রুথদিদি! তোমাকে বড় মেম ডেকেছেন।'

বড় মেম—মাদার। রুথ ভিজে হাতটা মুখে বুলিয়ে নিলো।

চৈত্রমাসের গরম। সন্ধ্যাবেলায় বইবে ঝিরঝিরে হাওয়া, কিন্তু এখনো তার দেরি আছে। মাদার জেন এত গরমের মধ্যেও লম্বা-হাতের জামা প'রে লেখাপড়ার কাজ করছিলেন। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ, তা ছাড়া ঠাণ্ডা হবার মতো আর কোনো ব্যবস্থা মাদারের ঘরে নেই। ধবধবে সাদা রং গোলাপী হয়ে গেছে গরমের আঁচে। স্নুনীল নয়নতারা। কপালের কাছে লুটিয়ে আছে সোনালী চুল। একমাস আগে সেগুলো ছেলেদের মতো করে ছাঁটা হয়েছিল, এখন বেড়ে, কপাল বেয়ে ঘাড়ে এসে নেমেছে। সুন্দর মুখশ্রী, সুন্দর তনুশ্রী। আরো সুন্দর ছিল আগে। এখন পঁয়তাল্লিশ বছরের কৃচ্ছ্রসাধিকা সন্ন্যাসিনীর শ্রী আর কত থাকবে!

মাদার আগে ছিলেন মিস্ রিড্ল। মিস্ রিড্লের ভাই

বিলাতের কমন্‌স্‌-সভার হোমরা-চোমরাদের একজন। রিড্‌লরা ধনী পরিবার। মিস্‌ রিড্‌ল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এম. এ.। সংসার ছেড়ে প্রভুর সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। সিস্টার জেন আগের মামণির মৃত্যুর পর মাদার হয়েছেন দু'বছর হলো। ফাদার স্ট্রং মাদার জেনের খুব প্রশংসা করেন—'সি ইজ এ ফাইন লেডী, বাট এ বিট সেন্টিমেন্টাল।'

জেনের সংসার-ত্যাগের মধ্যে কোনো হৃদয়গত কারণ আছে কিনা কে জানে! তবে মাদারের মুখের মধুর হাসিটি কখনো কোনো ছায়ায় মলিন হতে দেখা যায় না।

রুথকে পাশে বসিয়ে মাদার কনক ও মিষ্টার জোসেফের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পরম ভব্য কণ্ঠস্বর। বাংলা ভালোই জানেন। বললেন—'রুথ! আমাদিগকে অধিকতর পাঠ করিতে হইবে।'

রুথ জানালো সে নিয়মিতভাবেই লাইব্রেরি-ঘরে যায়।

মাদার বললেন—'আমি ঐ পাঠের বিষয় বলিতেছি না। বি. এ. পরীক্ষা দিবে এবং আমি ভারতীয় দর্শন ও বাংলা শিক্ষা করিব।'

রুথ আশ্চর্য হলো না। তার বি. এ. পরীক্ষা দেবার কথা চলছিলই। মেয়ে-স্কুলে অষ্টম শ্রেণী খোলা হয়েছে। সদর বালিকা-বিদ্যালয়ে মিশনের মেয়ে পাঠাবার ইচ্ছা আর কর্তৃপক্ষের নেই। ওখানে ভর্তি হয়ে, হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে মিশে, তারা আবার পৌত্তলিক হয়ে পড়তে চায়। তখন মেয়েগুলি বেশী হাসে। উপন্যাস পড়ে, পাউডার মাখতে চায়,—সবচেয়ে বড় কথা—দুর্গাপূজার সময় বিসর্জন দেখবার জন্য নদীর পাড়ে যাবার আগ্রহে অস্থির হয়ে ওঠে। সুতরাং মেয়েরা যাতে মিশন-স্কুলেই শেষ পর্যন্ত পড়তে পারে সেই চেষ্টা চলছে। রুথের বি. এ. পাসের উপর স্কুলের ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করছে। মাদারেরও এ-দেশী শাস্ত্র পড়বার ইচ্ছার কথা সবাই জানে। কিন্তু তাদের পড়াবে কে?

রুথের জিজ্ঞাস্থ চোখের উত্তরে মাদার জানালেন—ছেলেদের স্কুলের তপনবাবু পড়াবেন।

—'তপনবাবু !!'

—'কেন ? চমকাবার, আশ্চর্য হবার কারণ কি আছে ? হোয়াট্‌স দ্যা হার্ম ? তিনি পড়ালে ক্ষতি কি ?'

মাদারের মনে পড়লো কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা। এক পলকের আধখানার জন্য কঠিন দেখালো তাঁর চোখ। রুথ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

—'সত্যি, তপনবাবু পড়ালে ভালোই হবে।'

—'হ্যাঁ, ভালো হবে। হি ওয়াজ এ ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট। দর্শনশাস্ত্রে অনার্স ছিল।' খুশীমনে বললেন মাদার।

ফাদার সব ঠিক করেছেন। সকালে রুথ পড়বে, সন্ধ্যাবেলা মাদার। পয়লা মে হতে পড়া আরম্ভ হবে। এখনো পাঁচদিন বাকী আছে। রুথ কী কী বিষয় নিয়ে পড়তে চায় ভেবে রাখা ভালো। দর্শন আর ইতিহাস মন্দ নয়, রুথ কি বলে ?

মাদারের সঙ্গে কথা বলে রুথ নিজের ঘরে ফিরে এলো। ফুলমণি মাটির কলসী ভরে জল দিয়েছে নাইবার ঘরে। আলনায় হাত বাড়িয়ে রুথ শাড়ি তুলে নিল। শাড়িখানা মামুলী, কিন্তু ব্লাউজ ও পেটিকোটে রয়েছে কনকের হাতে বোনা সুন্দর লেস। তপনবাবু তাদের পড়াবেন। রুথ আর মাদারকে পড়াবেন তপনবাবু !!

চার বছর আগের পুরোনো দিনে ফিরে গেল রুথ। সদর বালিকা-বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সে। তারাই স্কুলের প্রথম ব্যাচ্। তপন সদ্য মিশন-স্কুলে ঢুকেছে। কনক অনেক কষ্টে ফাদারকে ধরে তপনকে রাজী করিয়েছিল সপ্তাহে দু'দিন রুথকে ইংরেজী পড়াতে। তপন পড়াতে এলো। এমন সে বহু ছাত্র

পড়ায়। কিন্তু বাজী হলোনা টাকাব কথায়। কনক উল্লসিত হয়েছিল। কাল্পনিক প্রত্যাশা তাকে অকাবণ আনন্দ দিয়েছিল। রুথও খুশী হয়েছিল বইকি। তরুণ দেবতাব মতো তপন যখন বেলস্ পার্কে ক্রিকেট খেলতো তখন আশেপাশেব কোনো খ্রীষ্টান বাড়ীব মেয়েবাই বাদ থাকতো না ভিড় জমিয়ে খেলা দেখতে আসতো। তপন এলো। গ্রামাব-ট্রান্স্লেশনে ভবে গেল রুথেব সব অবসব। ষোলো বছবেব মেয়েব জীবনে আনন্দেব বান হয়ে ফুটলো ব্যাকবণ। অনুবাদেব খাতা উপযুক্ত ইংবেজীব প্রসাধন-চাতুর্যে এতটাই সুন্দবী হয়ে উঠলো যে তপন বলতে বাধ্য হলো—'বাঃ।'

তাবপব মুখ তুলে তাকালো। সামনেব দেয়ালে ঝুলছে হাতে আঁকা ছবি। একটি ছেলে ঘুমিয়ে আছে গাছেব তলায়, নীচু শাখায় দুটি পাখী! সুন্দব অক্ষবে লেখা—

"তাবা পাখীব ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে
পাখীব ডাকে জাগে।"

জিজ্ঞেস কবলো—'কে এঁকেছে ছবি?'

—'আমি।' রুথ উত্তব দিলো।

—'বাঃ।' আবাব বললো তপন।

এমন সময় ঘবে ঢুকলো কনক। হাতে তাব মস্ত ডিশ্-ভবা খাবাব। থালাটা তপনেব সামনে ধবে দিল সে। 'বাড়ীব তৈবী খাবাব। একটু খেয়ে দেখুন, তপনবাবু! রুথ, জল নিয়ে আয় একগ্লাস।'

তপন মুখ তুলে তাকালো। ষোলো আব একুশ বছবেব তারুণ্য যে মোহময় পবিবেশ সৃষ্টি কবেছিল তা খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়লো। তপন খাবাবগুলো ছুঁয়ে ফেলবাব ভয়েই যেন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তাবপব সোজা দবজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আব সে রুথকে পড়াতে আসেনি।

রুথ সেদিন সারারাত কেঁদেছিল। কনক চেঁচিয়ে-মেচিয়ে

যা-তা বলেছিল তপনকে, কিন্তু খুশী হলো কনকের প্রতিবেশিনীরা। কনকের বড় সাহস! তপনবাবুকে মেয়ে পড়াতে আনে, খাওয়াতে চায়। দিয়েছে তপন থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। তারপর গেছে, —কতদিন গেছে তারপর। রুথ এখন কুড়ি বছরের, টিচার-দিদি। আবার তপন তাকে পড়াতে আসবে। রুথ গায়ে জল ঢাললো। চৈত্রের প্রথম বাতাস তখন ঘরে ঢুকে পড়েছে। জল আর বাতাসের ছোঁয়া লেগে শির্‌শির্ করে উঠলো কুড়ি বছরের মেয়ের দেহ।

॥ চার ॥

সহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার ছিলেন শিবেশ চৌধুরী। তাঁরই মেজছেলে তপন। শিবেশবাবু কেবল ডাক্তারই ছিলেন না। গরীব-দুঃখী তাঁকে জানতো আর মানতো মা-বাপ বলে। কেবল ওষুধ আর পথ্য নয়, রোগীর প্রাত্যহিক জীবনের নানা আয়োজন যোগাবার জন্যও তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হতো। তাইতো পাঁচ বছর আগে যখন তিনি হঠাৎ মারা গেলেন, তখন যেমন ভিড় করে লোক শোক প্রকাশ করেছিল, তেমনি ভিড় করেই দুশ্চিন্তা ঢুকেছিল তপনের মায়ের মনে। দানে ভাণ্ডার শূন্য। তপন সবে বি. এ. পাস করেছে। ছোট ছেলে বিলু একরত্তি। বড় ছেলে দুর্দান্ত, ডাকা-বুকো। জোড়পুকুরের পাড়ে কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের মাথা বাঁচাতে গিয়ে লাঠি খেয়েছে পুলিসের। নানা গুপ্ত-সমিতির সঙ্গে সুমন জড়িত বলে সরকারী মহলে প্রচার। তাদের নথিপত্রে প্রমাণও আছে নাকি কিছু কিছু। সুমনের নামে ওয়ারেন্ট আছে, ঘোষণা আছে পাঁচশো টাকা পুরস্কারের। কিন্তু সেই ছ'ফুট লম্বা অর্জুনের মতো সুন্দর ছেলে কোথায় যে লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। লোকে বলে জাপান পালিয়েছে। মাদ্রাজে কে নাকি দেখেছে কুলীর ছদ্মবেশে। মা প্রথম প্রথম দিনরাত কাঁদতেন। শিবেশবাবু স্ত্রীকে বলতেন—'কেঁদোনা, কেঁদোনা তুমি। পৃথিবী আলো করা আমি তোমার ছেলেকে খুঁজে আনবো।' খুঁজে আনবার সময় আর হলোনা তাঁর। দু'দিনের জ্বরে ভুগে, নিজেই চলে গেলেন অজ্ঞাত জগতে।

সুমনের কথা ভাবতে বসলেই মায়ের চোখ জলে ভরে যায়।

আর তাকে না ভেবেই বা থাকা যায় কতক্ষণ? প্রথম সন্তান মনা। তার সঙ্গে যে মায়ের সেই বউ-কালের সোনার কাহিনী জড়িয়ে আছে।

বারো বছরে মায়ের বিয়ে হয়েছিল। বামুনদের ঘরে মেয়ে এতবড় করবার চল নেই। আট—বড়জোব দশ, তার বেশী পেরোয় না,—বামুন-বাড়ীর মেয়ে চেলীর ঘোমটা টেনে চলে শ্বশুরবাড়ী। মায়ের বাপের বাড়ী ছিল বৈদ্যপ্রধান গ্রামে। বৈদ্যদের মেয়েরা বড় হয়, লেখাপড়া শেখে, সূচিশিল্প আয়ত্ত করে। মাও তাদের সঙ্গে থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন। ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলেন তিন টাকা। পরীক্ষাব ফল না বেরুতেই বিয়ে হয়ে গেল। তাবপর বিক্রমপুর হতে মস্তবড় পানসি নৌকা ক'বে, শাশুড়ীর সঙ্গে স্বামীব কাজের জায়গা এই সহরে এসে একদিন পৌঁছালেন। কত সুখ, কত থর্থরি বুকের মধ্যে! তারপর মনা, তপু, দলনী, বিলু একে একে কোলে এলো। স্বামীর কত নামডাক, কত মান! কত ভালবাসতেন তিনি লেখাপড়া। 'বঙ্গদর্শন' প্রথম এসেছে এই সহরে হৈমবতী দেবীর নামে,—মেয়েব নামে প্রথম কাগজ।

তারপর এলো দেশের দুর্দিন। ১৯০৫ সালে ধড়লাট কার্জন বাংলাদেশকে দু'টুকরো করে দিলেন। বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হলো। দেশ ভরে গেল দুঃখে। বাঙালী শপথ নিলো—যে ইংরেজ কেবল স্বাধীনতা নিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, করেছে মায়ের অঙ্গহানি, ঘটিয়েছে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ—তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ বিলাতী কাপড় ছাড়লো। মেয়েরা কাঁচের চুড়ি আর পরলো না। বিলাতী সব কিছু বর্জন। সুরেন বাঁড়ুজ্যে বললেন—তিরিশে আশ্বিন অরন্ধন ব্রত পালবে বাংলার সব বউ আর মেয়েরা। তাই হলো। কোনো উনুনে আঁচ পড়লো না। উপোস করে সারা বাংলা শোক-

দিবস পালন করলো। কলকাতায় রাখিবন্ধন হলো। গঙ্গাস্নান করে সব বাঙালী হাতে হাতে রাখি পরলো। দেশ ভাগ করেছে, কিন্তু রাখির বাঁধন—প্রাণের বাঁধন কাটবে কোন্ সরকার? দলে দলে ছেলেরা এগিয়ে গেলো দেশের সেবায়। এই সহরে কি উত্তেজনা! আহা, দেবতার মতো মানুষ অশ্বিনীবাবু! তাঁর কথায় লোকে মরে বাঁচে। অশ্বিনীবাবুর কথায় মেয়েরা বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে দিলো, গয়না খুলে দিলো স্বদেশী-ভাণ্ডারে। আর চারণ ছেলে যজ্ঞেশর, এখন বুঝি তাকে সবাই বলে মুকুন্দদাস,—কী তার স্বদেশীগান! কী তেজ! একফোঁটা ছেলে,—অকুতোভয়। সুমন —তাঁর ষোলো বছরের ছেলে, সেও এগিয়ে গেল দেশের কাজে। মা থামাতে কি চাননি? চেয়েছেন। মা তো জানতেন যে-পথে মনা এগিয়েছে তার পদে পদে কত বিপদ, কত আশঙ্কা। কিন্তু তাঁর সাহসী মনা বারণ মানলো না, বললো- 'যদি তোমার হাত কেটে দিত কার্জন, তাহলে কি করতাম মা?'

দেশের সব ছেলেই এক কথা বললো। কেবল বললো না, ভাবলো। মন দিয়ে অনুভব করলো দেশমায়ের দুঃখ। তাই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র মুখে নিয়ে ছেলেরা চললো। রক্তে তাদের কী দুর্দম তেজ! মনে কী শক্তি! তাদের রুখবে কি ইংরেজ? বেয়নেটের খোঁচা, বুলেটের আগুন তাদের ভয় দেখাতে এসে হার মানলো। মরে মরে ছেলেরা মরণটাকে একেবারে তুচ্ছ করে দিলো। বাংলার লাট ফুলার বললো—'বন্দেমাতরম্' শব্দ চলবে না। 'বন্দেমাতরম্' নিষিদ্ধ শব্দ। 'মা' শব্দ উচ্চারণ অপরাধ। যারা ভয় মানলো না, তাদের মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি করলো, জেলে পুরে রাখলো ইংরেজ।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' কাগজে সেইসব অত্যাচারের রক্ত-মাখানো কাহিনী বেরুতো। ভিক্ষে নিতে এসে বোষ্টম, বৈরাগী ঠাকুরের নাম না ক'রে গাইতো—

"ফুলার, আর কি দেখাও ভয়,
দেহ তোমার অধীন বটে,
মন তো অধীন নয়!
হাত বাঁধবে, পা বাঁধবে,
ধরে না-হয় ফাঁসি দেবে,
মনকে বাঁধিতে পার,
তোমার এমন শক্তি নয়!"

কবিরা গান বাঁধলো—

"ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী
ও তোমার অঙ্গে শোভে না।"

সর্বনেশে উনিশশো ছয় সাল! প্রথম অনাবৃষ্টি, তারপর বন্যা। বাংলার শস্যভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেলো। চারদিকে কেবল ভাতের জন্য কান্না। অশ্বিনীবাবু বললেন—কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মিলনী হবে এই সহরে।

সবাই অশ্বিনীবাবুর ডাকে সাড়া দিলো। যে দুয়ারে তিনি গিয়ে চাঁদা চান, মানুষ প্রাণ নিয়ে আসে। বাঁধা হলো মস্তবড় প্যাণ্ডেল। রাজাবাহাদুরেরর হাবেলীতে ঘন ঘন বসলো আলোচনা-সভা। চোদ্দই আর পনেরই এপ্রিল সম্মিলনী বসবে। সহর ভরে কী উত্তেজনা! সব ঘরের ছেলে ভলাণ্টিয়ার। কুচকাওয়াজ চলছে। তাঁর সুমন একটা দলের ক্যাপটেন। শেষ-কৈশোরের ভাঙা ভাঙা গলা কী মধুর! সেই গলায় মাকে বলতো মনা তার উপর ভার অতিথি-পরিচর্যার। বলতো বাইরে থেকে আসবে কত লোক। মায়ের বুক কাঁপে, তবু বারণ করতে পারেন না। দেশও যে মা। মায়ের অপমানের প্রতিবিধানে যোগ দিয়েছে তাঁর ষোলো বছরের প্রথম সন্তান। কত লোক—ধনী মানী যোগ দিয়েছে এই কাজে। তাঁরা সুখে থাকতে পারতেন। শান্তির আরাম বিছিয়ে জীবন কাটাতে পারতেন, কিন্তু মায়ের ডাকে সব ফেলে পথে নেমে

এসেছেন। তাঁদের কথা বলতে বলতে সুমনের চোখ জ্বলে উঠতো। চওড়া কাঁধ, চওড়া বুক, সুন্দরবনের তরুণ বাঘের শক্তি গায়ে। একছুটে সে বেরিয়ে পড়তো। মা দেখতেন পথের বাঁকে কেমন করে সেই তরুণ বাঁশের মতন শরীর মিলিয়ে যায়। মনে হতো অভিমন্যুর কাহিনী,—ষোলো বছরের ছেলের শিরায় শিরায় কত তেজ! অমনি বুকটা ছাঁৎ করে উঠতো। কী অলক্ষুণে ভাবনা!

নানা জায়গা হতে কত লোক এসে বাড়ীতে অতিথি হলো। সহর লোকে থৈ-থৈ। কত নেতা এসেছেন। এসেছেন সুরেন বাঁড়ুজ্যে, যাত্রামোহন সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ব্যারিস্টার আবদুল লতিফ—তাঁর মেম বৌ, আর এসেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে কবি গান ধরেছেন। ভাবের আবেশে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছে—কিন্তু গান থামলো না। তিনটি কোকিল পাখী যেন গেয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছেন তিন কন্যা,—তিন রাজকন্যা যেন রূপে। তাঁরাই ধরে রাখলেন সুর। মা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। ফিস্‌ফিস্ করে কে যেন কানের কাছে বললো—'আপনি বাড়ী যান। ডাক্তারবাবু গাড়ী পাঠিয়েছেন।'

মা তক্ষুণি উঠে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন বাড়ীতে এসেছেন বুঝি নতুন অতিথি, মার কি না-গেলে চলে! বঙ্গলক্ষ্মী-শাড়ির আঁচল গুছিয়ে মা উঠে পড়লেন। গাড়ী নিয়ে এসেছিল কোচম্যান নজু মিঞা আর কম্পাউণ্ডার সুরেন চন্দ্র।

মা গাড়ীতে উঠতেই রবার-টায়ারের গাড়ী ছুটল দ্রুত। বাড়ী গিয়ে দেখেন নতুন অতিথি নেই। স্বামী বড় ঘরে এমাথা-ওমাথা পায়চারি করছেন। হৈমবতীকে দেখে থামলেন। কাছে এসে বললেন—'জোড়পুকুরের ধারে পুলিস মনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

মায়ের সব পৃথিবী আঁধার হয়ে গেলো নিমেষে।

পরে মা শুনলেন সব কথা। রাজাবাহাদুরের হাবেলী ছাড়িয়ে নেতাদের নিয়ে শোভাযাত্রা জোড়পুকুরের পাড়ে আসতেই পুলিস লাঠি চার্জ করেছে। ছেলেদের রক্তে পুকুরের জল লাল—তখনো তাদের মুখে 'বন্দেমাতরম্'। ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন সাহেবের আদেশমতো পুলিসসাহেব ক্যাম্প সভা বন্ধ করে দিলো। সম্মিলন আর শেষ হলো না। সেই-যে তাঁর সুমন—মনা হারিয়ে গেছে—আর তার খবর পাওয়া গেল না। স্বামীর প্রতিবিম্ব বড় ছেলে। তেমনি দরাজ মস্ত বুক, জোরে কথা, হো-হো হাসি। মা-অন্ত প্রাণ।

মায়ের ভাবনায় বাধা পড়ে। দাসী এসে জানায় কনক ধাই এসেছে।

ছোট মোড়াখানা হাতে করে মা তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আসেন। শাশুড়ী হুঙ্কার দিলেন—'চললে আবার কন্‌কির সঙ্গে আঁতুড়-ঘাঁটতে বুঝি?'

মা উত্তর দিলেন না। চল্লিশ পেরুলেও মা এখনো বউ। শাশুড়ীর বয়স আশি ধরো-ধরো। টকটকে দুধে-আলতায় রং। খড়্গের মতো উঁচু নাক। টানা-টানা চোখ অবশ্য এখন কোটরে ঢুকেছে। কপালে আর চিবুকে উল্‌কি। ঠাকুমা বলেন—'গোধূম। তখন গোধূম পরবার চল ছিল যে, তাইতো ঠাকরুন পরিয়ে দিয়েছিলেন।'

পাঁচ বছরে তাঁর বিয়ে হয়েছিল বাইশ বছরের স্বামীর সঙ্গে। ষোলো বছরে বিধবা হলেন দু'বছরের ছেলে কোলে নিয়ে। সেই ছেলেও নেই। নাতির সংসার। কিন্তু প্রতাপ প্রতিপত্তি একটুও কমেনি। সুরসুন্দরীকে পাড়া-পড়শীও সমীহ করে। খ্রীষ্টান-মিষ্টান তাঁর দু'চোখের বিষ। তপু খ্রীষ্টান ইস্কুলে পড়ায় বটে, কিন্তু স্নান করে, সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসে। মুশকিল বউটাকে নিয়ে। বউ একেবারে মেমসাহেব। খোকাই বউকে ধিঙ্গী তৈরী করেছিল।

মেম রেখে পড়িয়েছে, বোটে করে মফঃস্বলে নিয়ে গেছে। সাহেব-বাড়ীর পার্টিতে গেছে কতবার। খোকা যদি কোনো কঠিন প্রসব করাতে যেতো, সঙ্গে থাকতো বউ। সব শিখিয়েছিল সে বউকে। সুরসুন্দরীরও তখন এসব কত ভালো লাগতো। এখন যে কিছুই সহ্য হয় না, দিবানিশি আগুনের খাপরা পুড়ছে বুকে। কনক বাড়ী আসা মানেই কোনো পোয়াতি,—আর বউটা গিয়ে সোজা ঢুকবে আঁতুড়-ঘরে। না মানবে জাত, না মানবে ধর্ম! মরণ হয়না সুরর!

জামতলায় কনক দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে মোড়া দিয়ে মা একটা উঁচু শিকড়ের উপর বসলেন।

—'খবর কি কনক? রাজুদেব বাড়ী গিয়েছিলে?'

কনক মাথা নাড়ল। রাজুব মা আসন্ন-প্রসবা। বয়স তার সাতচল্লিশ। চোদ্দটি ছেলেমেয়ের মা। বড় ছেলে আর মেয়ের দরুন নাতি-নাতনীও আছে গুটিকয়েক। কে আরো ফল চায়? কিন্তু দেনেওয়ালা তো চাইবার অপেক্ষা রাখেন না। তাই রাজুর মার আবার হবে। শরীবে বক্ত নেই, বাড়ীতে অন্নের অভাব। এ সঙ্কটে ভরসা রাধিয়া। বাজুর মা এসে কেঁদে পড়েছে মায়ের কাছে।

—'মনার-মা, এবার আর বাঁচবো না। মরতে দুঃখ নেই, কিন্তু তিনটে অপোগণ্ড একেবারে ভাসবে।'

মা তাই কনককে খবর দিয়েছেন। বলেছেন রাজুর বাপ টাকা না দেয়, তিনিই কনকের প্রাপ্য মিটিয়ে দেবেন। এই নিয়েই কথা হচ্ছিল।

সামনের বাগানের দরজা ঠেলে তপন বাড়ীতে ঢুকলো। পড়ন্ত রোদের তাপে তার মুখ লাল, কপালে ঘাম। ডাকলো —'মা?'

মা তাড়াতাড়ি উঠে এসে ছেলের কাছে দাঁড়ালেন। তপন

বড় গোঁড়া। প্রায় ঠাকুমার মতোই তার ছোঁয়াছুঁয়ি, বাছবিচার। কনক জানে, তপনবাবু তাকে পছন্দ করেন না। তবে গতবছর বর্ষাকালে তপনই তাকে বড় বাঁচান বাঁচিয়েছিল।

আষাঢ় মাসের সন্ধ্যা। সারাদিন ধরে একটা শক্ত কেস করে কনক বিবির পুকুরের পাড় দিয়ে গাড়ীতে ফিরছিল। কোথা হতে এসে পড়লো প্রকাণ্ড এক ষাঁড়। ঘোড়া দুটো ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলো। জব্বরউল্লা ছিটকে পড়লো পুকুরে, আর গাড়ীটা হেললো নালার মধ্যে। কনকের চিল-চীৎকারে লোক জড়ো হয়েছিল অনেক, কিন্তু এগিয়ে এলেন শুধু তপনবাবু। তিনি কোথা হতে ফিরছিলেন বাড়ীর দিকে, কাদার মধ্যে নেমে কনককে টেনে, প্রায় কোলে করেই বের করে নিলেন। তখন কিন্তু একটুও বিতৃষ্ণা বা কিছু বোঝা যায়নি। তবে যখনি কনক তাঁকে ধন্যবাদ দিতে যায়—কিরকম লাল-লাল চোখে তাকান যেন!

কনক ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়লো তপনদের বাড়ী হতে। সেই খাবার দেবার দিন হতে তপন রাগ করে আছে, তবু ছুতোয়-নাতায় কনক তপনকে প্রসন্ন করতে চায়। বুঝবে কি তপন মায়ের প্রাণ! অমন সোনার রং আর চল্লিশ-ইঞ্চি-ছাতিওয়ালা জোয়ান ছেলের জন্য কি সব মেয়ের মায়েদের বুকই পুড়ছে না? কনক কুৎসিত, কনক খ্রীষ্টান ধাই, কিন্তু তার রুথ যে 'এঞ্জেল'—যাদের কথা বইতে আছে, যারা ঈশ্বরপুত্রের সেবায় থাকে। সহরে কোন্ বড় বাড়ীতে কনকের আনাগোনা নেই? কই, রুথের মতো একটি মেয়েও কি আছে কোনো হিন্দুবাড়ীতে? কেন রুথ রাজামিঞার অগাধ ঐশ্বর্যের দিকে ফিরেও চায় না তা জানতে, বুঝতে কি বাকী আছে কনকের? বুক ফেটে যায়, কিন্তু উপায় নেই। পাথর গলরে, তবু তপনকে নরম করা যাবেনা। নিজের দেমাক, চেহারা আর জাতের গরব নিয়ে তপন মট্‌মট্ করছে। জানে কি তার জন্য শুকিয়ে যাচ্ছে কনকের রুথ! হায় যিশু! সদাপ্রভু! তোমার কাছে কেবল

প্রার্থনাই করা যায়, কিন্তু তা সফল হয়না। হিন্দু হলে কনক তালতলার কালীমাকে মানত করতো, ডালি দিতো, হয়তো তাতে ফল ফলতো। যিশু তো নিজেকেই বাঁচাতে পারেননি। কালীমা? বাবাঃ! ভীষণ ভীষণ সব দৈত্য-দানব মেরে তাদের মাথাগুলো ঝুলিয়ে রেখেছেন গলায়! কনকের চোখে জল এলো। কনক যদি কনক-ধাই না হয়ে, উকিলবাবু সমর মুখুজ্যের গিন্নী হতো—তবে চতুর্দোলায় চড়িয়ে তপনকে জামাই করে আনতো। ঝম্‌ঝম্‌ করে জোকার পড়তো। ঢাকের বাদ্যে, রংমশালের আলোয় রুথ তপনের গলায় মালা দিতো। তাহলে কি আর রুথ দিদিমণি হতো? পরতো সাদা শাড়ি? ঢাকাই শাড়ি, সিঁদুর-আলতায় সেজেগুজে তপনের মায়ের কাছে কাছে ঘুর-ঘুর করতো তখন।

—'কনকদিদি! ও কনকদিদি! অমন হন্‌হন্‌ করে, বেজার মুখে যাচ্ছ কোথায়?'

কনক চমকে দেখলো নিজের বাড়ী ছাড়িয়ে সে অনেকদূর চলে এসেছে, দেখা যাচ্ছে মিশন-বাড়ী। সামনে দাঁড়িয়ে হরিশ। হরিশ মিশন-বাড়ীর ওয়াচার। বছর আটেক হলো সে খ্রীষ্টান হয়েছে। আগে ছিল নমশূদ্র, যাকে চলতি কথায় বলে চাঁড়াল। লেংটি পড়তো। বড় বড় চুল, নখ আর গায়ে দুর্গন্ধ। এখন হাফ-প্যাণ্ট, জালি-গোঞ্জ আর টেরিতে চকচকে চেহারা।

কনক দাঁড়াতে সে আবার বললো—'তোমার কাছেই চলছিলাম, দিদি।'

—'কেন?'—কনক হাসলো। 'তোমার আবার আমাকে দিয়ে দরকার কিসের? হাঁড়ি না জুটতে সরার কামটা কি?'

—'হাঁড়ির যোগাড় হয়েছে গো দিদি!'—দাঁত বের করে হাসলো হরিশ।

—'মনোরমা মত দিয়েছে। এখন বড়মেমকে ব্যাপারটা জানাতে

হবে। তা তোমার মেয়ে ছাড়া বড়মেমের অত কাছাকাছি আর কে বল? তোমার মেয়ে যদি এখন বড়মেমকে…'

—'মনোরমা মত দিয়েছে তোমায় বিয়ে করতে?'

কনক অবাক হতে গিয়েও থমকালো। মনোরমা প্রফুল্ল চাপবাসীর বড় মেয়ে। ছাত্রবৃত্তি পাস, মিশন-স্কুলের 'টু'-ক্লাসের দিদিমণি। প্রফুল্ল যাই হোক, মনোরমা সুন্দরী, লেখাপড়া জানা আঠারো বছরের মেয়ে। ইংরেজী পড়তে পারে, পিয়ানো পর্যন্ত বাজাতে জানে। তার বিয়ে হবে এই কালো মোষটার সঙ্গে,—যে ওর চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের বড়!!

কনকের নিশ্বাস পড়লো। এই-ই খ্রীষ্টান মেয়ের ভাগ্য! ছিমছাম চেহারা, লেখাপড়া, সেলাই, গান কিছুই তাদের বরাত খুলে দেয়না। বিয়ে করতে হলে, হরিশদের বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি? তাইতো কত মেয়ে বিয়ে না করে কুমারী থেকে যাচ্ছে। সিন্ধুবাবুর অমন দুই মেয়ে, অমলা বিমলা তো বুড়ীই হয়ে গেলো টিচারী করতে করতে করতে।

কনককে চুপ দেখে আবার তাগাদা দিল হরিশ—'কি গো দিদি, মেয়েকে দিয়ে বলাবে তো কথাটা?'

—'রুথকে বলবো।'

—'কেবল বললে হবে না, মঞ্জুর করিয়েও নিতে হবে বুঝলে? আর বাজার-টাজারও তোমাকেই করে দিতে হবে। তোমার বড় জবর পছন্দ।'

খোসামোদ করলো হরিশ। কথা না বলে পিছন ফিরলো কনক। কেন যে এত শিক্ষা দেন মেয়েদের বড়মেম!

॥ পাঁচ ॥

কাঁচের ডুম-ঘেরা টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় মুখোমুখি বসেছে তপন আর জেন—মাদার জেন। ছ'মাস হলো পড়া আরম্ভ হয়েছে। মাদার বাংলা বলতে ভালোই পারতো কিন্তু লিখতে জানতো না একদম। অক্ষর আয়ত্ত হয়েছে। মেধাবিনী। শিক্ষা তরতর করে এগিয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' শেষ। এখন পড়া হচ্ছে 'দুর্গেশনন্দিনী' আর 'গীতা'। 'দেবীচৌধুরাণী' তপনের অতি প্রিয় বই, কিন্তু মাদার গল্পের রস ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারেনি। ব্রজেশ্বরকে দিয়ে পা টেপানোর প্রস্তাবে তার মনে একটু আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ কর্মচারীকে বোকা বানাবার পর হতে জেনের কপালে যে ভ্রূকুটির ছায়া ঘনিয়ে ছিল—দেবীরাণীর বাসন মাজার পর্যায়ে এসে তা বেড়েই গিয়েছিল। 'গীতা'র নিষ্কাম কর্মযোগের রহস্যও তার ভালো বোধগম্য হয়নি। কিন্তু তপনের স্বর সুন্দর। উদাত্ত কণ্ঠের সংস্কৃত উচ্চারণ বড় শ্রুতিমধুর। তপন জগদীশবাবুর ছাত্র। বোঝাবার ক্ষমতা আচার্যের রবিবারের আসর হতে আয়ত্ত করেছে, সুতরাং 'গীতা' সম্বন্ধে জেনের উৎসাহ ক্রমবর্ধমান।

আরো একটা ব্যাপার ঘটেছে। পড়া আরম্ভ করবার আগে জেন বাঙালী যাদের জানতো, তারা সমাজের নীচু-স্তর হতে ধর্মান্তরিত খৃষ্টান। তাদের আচার ব্যবহার জেনের মনে করুণার সঞ্চার করতো। ব্রত নিয়েছিল এদের সংস্কার করবার। তপনের সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হয়ে সে হিন্দুদের মধ্যে যা দেখলো তা খৃষ্টীয় সভ্য সমাজের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।

তিন-চারবার গেছে জেন তপনের বাড়ী। সেই জুন মাসে তপনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো, তখন জেন প্রথম গেল তপনকে দেখতে। ভেবেছিল দেখবে স্বাস্থ্যের প্রতি চরম অবহেলা, নোংরা পারিপার্শ্বিক আর কুসংস্কার-মগ্ন একটি পরিবার। জেন প্রথমে অবাক হলো, তারপর মুগ্ধ হলো তপনের মাকে দেখে। বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। একটি চুলও পাকেনি। সুন্দর মুখ, দীঘল ক্ষীণ তনু। শুভ্র আবরণে দেখাচ্ছিল সেণ্ট মার্গারেটের মূর্তির মতো। তপস্যা-স্নিগ্ধ একটি পরিমণ্ডল মাকে ঘিরে রয়েছে! ফুলের গন্ধ-ভরা বাগান। ধবধবে ছিমছাম, ধুপের ধোঁয়ায় সুরভিত রোগীর ঘর। জেনকে মা চিবুক স্পর্শ করে স্নেহ জানিয়েছিলেন।

তারপর জেন কতবার গেছে মায়ের টানেই তপনের বাড়ী। বাড়ীর তৈরী মিষ্টান্ন, সাদা সাদা—নাম পাটিসাপ্‌টা,—ক্রীম-ভরা খাবার, জেন খেয়েছে খুশী হয়ে। মাকে বলেছে—'মা, আমাকে একটা বাংলা নাম দাও।'

মা জেনের নাম রেখেছেন—'কুসুম'। সে ফুলের মতো শুচি সুন্দর, ফুলের মতোই নিজেকে নিবেদন করেছে ভগবানের সেবায়। জেন 'কুসুম' নামটি বার বার উচ্চারণ করেছে আনন্দে। খাতা-বইতে কাঁচা বাংলা অক্ষরে নাম লিখেছে—'কুসুম'। সবচেয়ে জেনের মজা লাগতো হিন্দুদের গুরুজনের পা স্পর্শ করে সম্মান জানানোর প্রথা দেখে। তপনের ছোটভাই বিলু,—তাকেও জেনের ভারি ভালো লেগেছিল। চকচকে চোখ। সব সময় উৎসাহে চঞ্চল। নানা আবিষ্কারের চিন্তায় হরদম মাথা ঘামাচ্ছে। বাংলার নরম জলে কি করে জন্মালো এই ছেলে! টর্চের ব্যাটারি বানাবে, কলমে কলমে মিল খাইয়ে ফোটাবে নতুন ফুল। হকি-খেলায় হারাচ্ছে পুলিসদলকে, আবার মায়ের দ্বাদশীর দিনে ঢাকাই পরোটা বানালো অক্লেশে। সহরে বিলুবাবুর বাগানের

খ্যাতি আছে। মেইডেন হেয়ার আর এস্পারা মিশিয়ে কত যে তোড়া বিলু দিয়েছে জেনকে, তার অন্ত নেই।

এখন তপন পড়াচ্ছে 'দুর্গেশনন্দিনী'। তিলোত্তমা কুমার জগৎসিংহের নাম লিখে ব্রীড়ারুণ মুখে তাকিয়ে আছে। কুমারী-হৃদয়ে ছায়া পড়েছে, ফুটে উঠেছে প্রথম ভালবাসার ফুলটি।

মিশনের বড় ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে আটটা ঘোষণা করলো। পড়া সাঙ্গ হবার ইঙ্গিত। তপন মুখ তুললো বই হতে—'শেষ হলো না।'

—'কাল হবে।'— জেন বললো।

—'কাল? টুমরো ইজ সান্‌ডে।'

তপন উঠে দাঁড়ালো। ধীরে মিলিয়ে গেলো তার দেহ। শোনা যেতে লাগলো সবল যুবকের সুস্থ পদক্ষেপ,—তারপর তাও আর শোনা গেল না।

কাল সান্‌ডে—বিশ্রামের দিন। কাজ বন্ধ, পড়া বন্ধ। তিলোত্তমা—কোমল সুন্দরী মেয়ে। জেন যেন দেখতে পেলো তাকে।

সামনে তাকালেই স্কুল-বাড়ী। দোতলার ডানদিকের ঘরে আলো জ্বলছে,—সে-ঘরে থাকে রুথ। প্রাইভেট পরীক্ষার নানা অসুবিধা তাই স্কুলের কাজ ক্ষতি করেও কলেজেই ভর্তি হতে হয়েছে রুথকে। তপন তাকে সপ্তাহে তিনদিন ইংরেজী পড়ায়। রুথ কি 'দুর্গেশনন্দিনী'ও পড়ে তপনের কাছে? পড়ে কুমারী-হৃদয়ের থর-থর প্রথম আবেগের কথা? বাংলা বোধহয় পড়ছে না রুথ। মাতৃভাষায় সাহায্যের দরকার কি! ইংরেজী। ইংরেজী কী কবিতা আছে ডিগ্রী কোর্সে? শেলীর রহস্যমধুর ইঙ্গিত, বায়রনের আবেগ আর কীট্স-এর সৌন্দর্যের পদমূলে আকৃতি? তপন কেমন পড়ায় কে জানে? কিন্তু! জেন আবার মাদার জেন হয়ে গেল। কুড়ি বছরের মেয়ের কি উচিত হচ্ছে প্রেমের

কবিতা পড়া একটি হিন্দু যুবকের কাছে? ছোট, তপন অনেক ছোট মাদারের চেয়ে, কিন্তু বয়সের অপেক্ষা বেশী গাম্ভীর্য আছে ওর মধ্যে। কয়েকদিন আগে একটা মশা কামড়ে দিয়েছিল জেনের বাহুমূলে। মুখ থেকে থুতু এনে জায়গাটা একটু ঘষে দিতেই রীতিমতো ধমকে দিয়েছিল তপন তাকে। হাসি পেলো মাদারের। কাল স্যাবাথ্। কাল পড়া বন্ধ। ডে আফ্টার টু-মরো আবার তিলোত্তমার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু না। সেদিন তো তিলোত্তমার কথা পড়া হবে না। সেদিন 'গীতা'-ডে। তৃতীয় অধ্যায়, কর্মযোগ। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি। কেবল কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধি লাভ হয় না।

মাদার শোবার ঘরে ঢুললেন। দেওয়ালে ছবি ঈশ্বর-পুত্রের —ক্রুশ-বিদ্ধ যিশু। সন্ন্যাসিনী ছবির কাছে এসে দাঁড়ালেন। যিশু সকলকে ভালবাসতে বলেছেন। কৃষ্ণ বলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে? তপন বলে—অধর্ম, পাপ আর হিংসার বিরুদ্ধে।

॥ ছয় ॥

মা ক্ষীরের ছাঁচ তুলছেন। সহরে গুরুদেব গিরিমহারাজ এসেছেন। আছেন আশ্রমে। মায়ের তৈরী খাবার তাঁর কতটা ভালো লাগে তিনিই জানেন, কিন্তু মায়ের ভালো লাগে, তৃপ্তি হয় গুরুকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে। বিলু পাশে বসে মায়ের নিপুণ হাতে তোলা সন্দেশ দেখছিল আর বোঝাতে চেষ্টা করছিল গুরুকে ভোজন করালে স্বর্গে যাবার উপযুক্ত পুণ্যলাভের আশা কম; বরং হরলাল মিস্ত্রীকে খাওয়ালে সে শীগ্‌গির সেরে উঠে ডকের কাজে যোগ দিতে পারবে। বেঁচে যাবে গোটা পরিবারটা, আর মায়েরও অগুন্‌তি পুণ্যলাভ হবে। মা প্রথমে মৃদুহাসির প্রশ্রয়ে বিলুর কথা শুন্‌ছিলেন, বিরক্ত হয়ে উঠলেন—'বিলু, গুরুদেবকে ভোগ দেবার আয়োজনে যা ইচ্ছে তা বল্‌ছিস। বাবাকে খাওয়ানোর সময় তো খুব উৎসাহ দেখি।'

বি. এম. স্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক ঋষিতুল্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় সব মেয়েরই বাবা।

—'কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য, মা!'— বিলু বললো—'স্যারের সঙ্গে কার তুলনা?'

মা উত্তর দেবার আগেই সুরসুন্দরী ঝন্‌ঝন্ করে উঠলেন—'বিলু তো ঠিকই বলেছে। বাবার সঙ্গে কার কথা চলে?'

মা উত্তর দিলেন—'সে তো ঠিক কথা, কিন্তু—' কথা শেষ হলো না। বাইরে মহা গোলমাল উঠলো। অনেক উঁচু আকাশে —মেঘের কাছাকাছি দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এরোপ্লেন,—উড়োজাহাজ। শুনেছে সবাই এরোপ্লেনের কথা, দেখা হয়নি বড় একটা। হৈ-হৈ

করে পাড়া ভেঙে পড়েছে, ছুটছে ছেলের দল। প্রাণপণে চোখ বিস্ফারিত করে স্থরস্থন্দরী বললেন—'কই লো বউ! আমি যে কিছুই দেখলাম্ না।'

বিলু বললো—'আমি শীগ্গিরই এরোপ্লেন বানাবো, তখন দেখো। এখন চল, কেমন করে বানাবো, তোমায় বলি।'

বিলুর উপর ঠাকুরমার অগাধ বিশ্বাস। এরোপ্লেন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে তিনি বিলুর সঙ্গে এসে, পড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন।

—'ধেৎ! মেজদা রয়েছে।' বিলু ছুট দিলো।

—'ওমা! তপু এসেছিস? চান করবি না?'

কপাল হতে কোঁকড়া চুলগুলি পিছনে ঠেলে দিয়ে তপন হাত গলিয়ে পাঞ্জাবিটা খুলে ফেললো, গেঞ্জিও। দেখা দিল চিকন গৌর প্রশস্ত-বুক, সিংহ-কটি। হেসে বললো—'এইমাত্র এসেছি। স্নান দশ মিনিট, তারপর প্রস্তাব—কি বল?'

ঠাকুমা গল্পকে বলেন প্রস্তাব। রাত্রে অন্তত ঘণ্টাখানেক তপুর কাছে প্রস্তাব না শুনলে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তপু প্রস্তাব বলে,—আগের দিনের সব সত্যিকথা। সোনার মেয়ে-পদ্মিনী পুড়ে মরেছে। রাণা প্রতাপসিংহ বনে বনে ঘুরেছে, খেয়েছে ঘাসের রুটি, তবু মুসলমানের কাছে হার মানেনি। শিবাজী দস্যি ছেলে,—তার মায়ের নাম জীজাবাঈ। রোজ রাতের বেলা তপু এসব গল্প বলে। মা শোনেন, ঠাকুমা শোনেন, বিলু শোনে আর সল্তে পাকাতে পাকাতে কিংবা স্থপুরি কুঁচোতে বসে শোনে মুখ্যি ঝি। কখনো উচ্ছ্বাসভরে বলে ওঠে—'আহা মা, শিবাজী যেন অবিকল আমাদের মনা!'

তপুর কথা থেমে যায়। মা ধীর পায়ে উঠে দাঁড়ান। মনে পড়ে টাইগারের শিকল খোলা হয়নি। রমণীকে বলেন কুকুরটাকে ছেড়ে দিতে।

বিলু জিজ্ঞেস করে—'সত্যি যশোরের প্রতাপাদিত্যের কামান ছিল মেজদা ?'

কেবল ইতিহাসের গল্প নয়। বর্ষার ঝিরঝিরে রাত্তিরে তপু রবীন্দ্রনাথের পদ্যও পড়ে। যখন বলে—"এবার আমারে লহ করুণা করে"—তখন ঠাকুমাও আকুল হয়ে ওঠেন, মনে মনে সেই প্রার্থনাই করেন—ঠাকুর, এবার আমায় পার কর।

তারপর এগারোটা বাজলে ঘুম নামে বাড়ীতে। বিলুর স্বপ্নে এরোপ্লেন বানানো শেষ হয়ে যায়। খোকা আর মনা ফিরে আসে তাদের মায়ের কোলে। তপুর মগ্ন-চৈতন্যে হদিস মেলে না সরস্বতী লম্বা গাউন পরেছেন কেন !

সেদিনও গল্পের আসর জমে উঠেছে। তপন বলছে ইংলণ্ডের সিংহ-হৃদয় রাজা রিচার্ডের কথা। তীর্থস্থান রক্ষা করবার জন্য রাজা লড়তে গেছেন মুসলমানের সঙ্গে। দেশের প্রাণ রিচার্ড রাজা। মেয়েরা মাথার চুল বিনিয়ে তাঁর ধনুকের ছিলা তৈরী করে দিতে চায়।

হঠাৎ বাইরে ব্যস্ত গলা শোনা গেল—'মেজবাবু ! মেজদাদা !'

মুখিয্য দরজার কাছে বসে ছিল, গলা বাড়িয়ে দিল—'আতাউল্লা।'

আতাউল্লা কাছেই সাগরদী রোডে কেরোসিনের দোকানদার। বুঝি ছেলের অসুখ, কিংবা নিজেরি হয়েছে আবার কলিকের ব্যথা,—মেজদার তাই খোঁজ পড়েছে। তপন একটু হেসে বাইরে গেল। অনুসরণ করলো বিলু। না, নিজের কথা বলতে তো আসেনি আতাউল্লা। কি যে ঝড়ের মতো বললো আতা, মা কিছুই বুঝলেন না। তপন একলাফে দরজার পাশ হতে বিলুর হকি-স্টিকটা তুলে নিয়ে ছুটলো সাগরদী রোডের দিকে। বিলুও দাদার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রথম পা বাড়িয়েছিল, তারপর একটু থেমে, ছুট দিলো উল্টো দিকে। মা, ঠাকুমা উদ্বিগ্ন হয়ে গেটের কাছে

দাঁড়ালেন। মুখ্যি রমণীদাদুকে ডাকতে লাগলো—'ও বুড়ো, ঝিমুনি ছেড়ে ওঠ-না। দেখ ছেলেটা গেলো কোথায়।'

সাগরদী রোড। অন্ধকার তরল হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটির বিরল আলোয়। তপন ইশারার মধ্যে মোড়ের মাথায় পৌঁছে গেল। মস্তবড় ব্রূহাম গাড়ী। ফ্রান্সিস উইলিয়াম ডি'সিলভা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে কনক চীৎকার করে কাঁদছে—'ও উইলি-বাবা! রুথ তোমার বোন। সিস্টার। সবাই জানে। ফাদারও জানে।—ও উইলি-বাবা!'

উইলিয়াম কনককে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে। জাপটে ধরেছে রুথকে। রুথের চুল খুলে গেছে, আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। উইলিয়ম তাকে গাড়ীর দিকে টেনে আনছে। আশে-পাশে ছোট ভিড়, কিন্তু কে আসবে মাতাল ডি'সিলভার কাছে? বন্দুক আছে না?

তপন দাঁড়ালো উইলিয়ামের সামনে।

—'লিভ হার, মিস্টার ডি'সিলভা!'

—'হোয়াট্? ও, ইউ রোগ টপন চাউড্রি!' জড়িতকণ্ঠে ডি'সিলভা বললো। হ্যাঁচ্কা টানে রুথকে নিয়ে এলো গাড়ীর পা-দানির কাছে।

—'তুমি বড় বদমাস আছ, বিউটিফুল বীচ!' আর একটুও দ্বিধা না করে তপন ডি'সিলভার রগ ঘেঁষে ঘুষি চালালো, রুথকে ছাড়িয়ে নিল উইলিয়ামের বাহুপাশ হতে। উইলিয়াম দুর্বৃত্ত হলেও সচরাচর এমনটা করে না। রুথ একে মিশনের মেয়ে, তার উপর পিতৃপরিচয়টা তার, উইলিয়মের লালসার অনুকূল নয়। আজ সে পানের মাত্রা ছাড়িয়ে ছিল। টলছিল। কিন্তু ঘুষি খাবার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজের বাচ্চার নেশা কেটে গেল। তপন অচৈতন্য-রুথকে ধরেছিল, তার নাকের উপর বিরাট মুষ্ট্যাঘাত করলো।

তপনের নাক দিয়ে ঝর্‌ঝর করে রক্ত ঝরলো। রুথকে ফেলে দিয়ে, ডি'সিলভার পায়ে সে হকি-স্টিকের ঘা বসিয়ে দিলো। — 'ও গড্‌!' ডি'সিলভা ঝুঁকে পড়লো পথের উপর। কিন্তু একমুহূর্ত। তক্ষুণি নিজেকে সামলে নিয়ে হাত দিলো প্যাণ্টের পকেটে,—সেখানে আছে তার পিস্তল। অঘটন ঘটতো, নিশ্চয় গুলী করতো ডি'সিলভা। কিন্তু ছুটতে ছুটতে এসে পড়লো বিলু,—সঙ্গে তার সুবেদার ঝুলন সিং এবং আরো কয়েকজন।

তপন চীৎকার করে বললো—'শীগ্‌গির কেউ ফাদারকে খবর দাও।'

উইলিয়ামের মদের ঝোঁক কেটে গিয়েছিল। সে জানতো জমিদার হলেও ফাদার তাকে ছেড়ে কথা বলবেন না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উপরও ফাদারের খুব প্রভাব। তপনের দিকে একবার চেয়ে সে গাড়ীতে উঠে বসলো। তেজী ওয়েলার কোচম্যানের চাবুক খেয়ে উধাও হলো একনিমেষে।

বাড়ীর সবাই জড়ো হয়েছে পথের ধারে, গেটের কাছে। দেখা দিল হারিকেনের আলো, লোকজন। —ওমা! ধরাধরি করে আনছে কাকে? ও কি তপন? ও কি বিলু?— মা ভয়ে বিবর্ণ হলেন। বুকে হাতুড়ি পিটতে লাগলো। ঠাকুমা উঠলেন কেঁদে। সবাই এসে পৌঁছালো। রুথ—কনক-ধাইয়ের মেয়ে, তাকেই ধরাধবি করে আনছে আতাউল্লা আর রমণী। তপনের নাক ফুলে মস্ত ঢোল, রক্তে গেঞ্জি ভিজে। রুথ অজ্ঞান। নীল চোখ বোজা, চুল শাড়ি কাদায় মাখামাখি। মা সব শুনলেন। আহা, সোনার পুতুল। কী দুর্দশা করেছে ডি'সিলভা। বছরে এমন দু-একটা কাণ্ড করেই থাকে এই লম্পট বিদেশী জমিদারগুলো। তা বলে রুথ? রুথের জন্মবৃত্তান্ত যাই হোক-না কেন—সে পঙ্ক ছাড়িয়ে বহুদূরে ফুটেছে। রূপে গুণে, সেবায় শালীনতায় অমন মেয়ে সহরে দুটি নেই। মা দেখেননি তাঁর জীবনে রুথের মতো আর একটি মেয়ে।

তপনের নাকে খুব আঘাত লেগেছে; রক্ত ধুয়ে, তার নাকে ভিজে রুমাল জড়িয়ে ঠাকুমা বক্‌বক করতে লাগলেন। বিলু চকচকে চোখে সিংজীর কাছে জানতে চাইলো—রাতে ক্লাব হতে ফেরার পথে, উইলিয়ামের মাথা ফাটালে সিংজী তাকে না অ্যারেস্ট করে পারবে কিনা? মাথা ফাটাতে বিলু নিজে যদি একান্তই না পারে—দানেশ নিশ্চয়ই পারবে। দানেশ সহরের সবচেয়ে বড় গুণ্ডা, বিলু তার 'বিলুভাই'। গোলমালের খবর পেয়ে বিলু সোজা ছুটেছিল তাদের বাড়ীর কাছের পুলিস-ব্যারাকে। সে ওখানে সবার প্রিয় বন্ধু, তা ছাড়া ডি'সিলভার উপরেও সন্তুষ্ট নয় কেউ। বিলুর কথা শুনে সুবেদার ঝুলন সিং পায়ে পট্টি না জড়িয়েই ছুটেছিল।

মা লাগলেন রুথের সেবায়। খানিক পরে রুথ চোখ চাইলো। এত লোক কেন? কোথায় এসেছে রুথ? মনে পড়লো রাত আটটায় রেভারেণ্ড আদিবাবুর বাড়ী হতে ফিরছিল সে। সামনের সপ্তাহে মনোরমার বিয়ে, রেভারেণ্ডের নির্দেশ জানতে গিয়েছিল রুথ। একথা-সেকথায় রাত হয়ে গেল। পথে ডি'সিলাভা—! এ কি ডি'সিলভার বাড়ী? ঝাপসা চোখ তখনো পরিষ্কার হয়নি, কাটেনি ঘোর। চমকে উঠে বসতে যেতেই রুথ ধরা পড়লো এক কোমল বাহুবেষ্টনে। আনত হলো তার ওপর একটি স্নেহকরুণ মুখ। এ মুখ তো কনকের নয়! এমন মুখ কতবার রুথ কল্পনায় বসিয়েছে কনকের ওপর।

মা জিজ্ঞেস করলেন—'কী কষ্ট হচ্ছে রুথ?'

ওদিক হতে ভারি গলায় কে বললো—'জ্ঞান হয়েছে নাকি মা?'

ও কে কথা বলছে? ও-গলা তো রুথ চেনে—খুব ভালো করে চেনে। ষোলো বছর বয়স হতে তার বুকে বাসা বেঁধে আছে এই স্বর। যখন পড়েছিল লুসী গ্রে-র কথা,—ড্যাফোডিল্‌সের নাচার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকও দুলে উঠতো; এখন এই গলায়ই তো শুনছে শেলীর স্কাই-লার্কের পাখা-ঝাপ্‌টানো।

তপন। এটা তপনের বাড়ী। তপনের মা। রুথের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। মা আদর করে চোখ মুছিয়ে দিলেন। 'আর ভয় কি রুথ? তোমার মাকে দেখবে? কনক, এদিকে মেয়ের কাছে এসো।'

কাঁপতে কাঁপতে কনক এসে রুথের বিছানার পাশ দাঁড়ালো। ঠোঁট কেটে গেছে, চুল আলুথালু, এখনো কাঁপছে থর্থর করে। রুথকে আগলে ছিল সে, ডি'সিলভার প্রথম চোটটা তার উপর দিয়েই গেছে।

মিশন হতে লোকজন নিয়ে ফাদার নিজে এসে উপস্থিত হলেন। সমস্ত মুখ টক্‌টকে লাল। তপনকে ধন্যবাদ দিলেন। সস্নেহে রুথকে জড়িয়ে তুলে নিলেন গাড়ীতে।

সুরসুন্দরী হাঁকলেন—'মুখ্যি! গঙ্গাজলের হাঁড়িটা নিয়ে আয়।'

রাত। অনেক রাত হয়ে গেছে। তপনের নাক হতে রক্তপড়া বন্ধ হয়েছে কিন্তু ব্যথা করছে জবর।

বিলু বললো—'জানো ঠাকুমা, রুথকে ঠিক সীতার মতো লাগছিল, ডি'সিলভা যেন রাবণ। কিন্তু ভেবে দেখ, রামের চেয়ে মেজদার গায়ে জোর কত বেশী। রাম তো সীতাকে একা উদ্ধার করতে পারেনি, মেজদা কিন্তু একাই রুথকে উদ্ধার করলো।'

মা হেসে বললেন—'তুই তবে লক্ষ্মণ।'

'দূর! আমি লক্ষ্মণ হয়ে শক্তিশেল খেতে যাবো কেন? আমি মহাবীর হনুমান।'

ঘরসুদ্ধু সবাই হেসে উঠলো। ব্যথা ভুলে হাসলো তপনও। সত্যি, রুথকে সীতার মতো ভাবা যাচ্ছে অক্লেশে। সেই আলুলায়িত চুল, লুণ্ঠিত-আঁচল, থরকম্পিত মৃণালদণ্ডের মতো তন্বী-তনু। চমকে উঠলো তপন। কি ভাবছে? কি ভাবছে সে?

পাশবালিশ জড়িয়ে তপন চোখ বুঝলো।

॥ সাত ॥

"চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী ॥"

দুষ্মন্ত মধুকরকে হিংসা করছে—শকুন্তলার অধর হইতে সে সুধারস ফাঁকি দিয়ে পান করে নিচ্ছে বলে।

রুথ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে। ইতিহাস আর সংস্কৃত নিয়ে পড়ছে সে। কোলের উপর বই রেখে, ঝুঁকে বসে রুথ পড়ছিল। চূর্ণ কুন্তল উড়ছে মুখের চারপাশে। ডি'সিলভা-ঘটিত ব্যাপারের পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেলেও তার মন এখনো গ্লানিমুক্ত হয়নি, শরীর হয়নি সবল। দু'মাস তো রুথ বিছানায় শুয়েই ছিল। তার জন্য মিশনের সবাই অনেক করেছে। ফাদারের কাছে ডি'সিলভা নাকি ক্ষমা চেয়েছে। ইভা ডি'সিলভা দু'তিনবার রুথের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছে। মাতালের মাতলামি বলেই মেনে নিয়েছে সবাই ঘটনাটাকে। কেবল কনকেরই ঠোঁটের কাটা দাগ মিলায়নি এখনো, আর কাটেনি তার মনের ভয়। সে জানে এই দুর্দান্ত ডি'সিলভাদের। পরে হয়তো টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে। সান্ত্বনা পাবার মতো একটা পরিস্থিতিও সৃষ্টি করে তোলে, কিন্তু যা চায় তা না নিয়ে কখনো ছাড়েনা এরা। এদের ধর্ম, কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নেই। রুথ যখন একবার উইলির চোখে পড়েছে তখন কী হবে তার ঠিক নেই।

কনক সর্বদা রুথকে সাবধানে রাখতে চায়। শহরের আর

একপ্রান্তে রুথ রোজ পড়তে যায়, অবশ্য যায় সে মিশনের গাড়ীতেই। কিন্তু তাতে নিরাপত্তা আর কতটুকু! ভরসা কেবল ফাদার। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও নাকি ডি'সিলভাকে বলেছেন—দেশী মেয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে টানাটানি করলে সাহেবদের মান যায়। দেশী মেয়েদের কথা কোন্ সাহেব-মনিবই-বা ভাবে! আয়া, চৌকিদারের বউ, বেয়ারার বোন---এদের তো সাহেবদের মন যোগাবার জন্য সর্বদাই তৈরী থাকতে হয়, আর তার ফলে আধা-সাদা, লাল-চুলো, কটা-চোখো যে বাচ্চা জন্মায়, তাদের জন্য রয়েছে 'অ্যাসাইলাম'। এইসব সাহেবদের টাকাতেই সেগুলো চলে। চালায়, উঁচু করে টিকটিকি-ঝুটি-বাঁধা খিট্‌খিটে মেম আর লম্বা পাৎলুন পরা সাহেবরা। তারা মিশনের ফাদার-মাদারদের মতো একদম নয়। দিনরাত বাচ্চাগুলোকে ধমকায়, মারে। খেতে দেয়না। তারপর কিছু টাকা জমিয়ে, সেই বুড়োবুড়ীরা বিয়ে করে বসে। তখন নিজেদের মধ্যে কী খেয়োখেয়ি রে বাবা! কনক দেখেছে না রতনপুরে ম্যাকিণ্টস্ সাহেবের অ্যাসাইলাম? সেখানেই তো ছিল সে রুথ জন্মাবার কিছুদিন আগে। অ্যাসাই-লামের কারবার দেখতো, আর কাঁদতো গুম্‌রে গুম্‌রে। তার বাচ্চারও হবে এই দশা। কেবল যিশুকে ডাকতো। মা-দুর্গাকেও ডেকেছিল বইকি।

তারপর একদিন রুথ কোলে এলো। কনকের কালো রং একটুও পায়নি। ধবধবে সাদা। সাহেব এসেছিল রতনপুরের কাছে ভোলার চরে শিকার খেলতে। কী মনে হলো, এলো অ্যাসাইলামে, মেম তো সঙ্গে নেই। আদর করে টিপে দিলো মেয়ের গাল। ইংরেজীতে কী বললো ম্যাকিণ্টস্ সাহেবকে। তারপর হতেই কনকের সব ব্যবস্থা অন্যরকম হয়ে গেল। আলাদা ঘর পেলো কনক। রুথের জন্য দুধ। রুথ একটু বড় হতেই সে চলে গেলো ক'লকাতায় দাইগিরি পড়তে। সাহেব তার ইজ্জত নিয়েছিল

সত্য, কিন্তু করেছেও অনেক। অনন্ত পুঁই মরে গেল! তা কনক কি করবে? অন্য স্বামীরা কি এমন অবস্থায় পড়লে নদীতে ঝাঁপ দেয়? তারা যতদিন পারে বউদের টাকা নেয়, তারপর সাহেবের মন চলে গেলে, দেয় লাথি মেরে বউটাকে তাড়িয়ে। দিব্যি নতুন ঘর পেতে বসে আবার। সাহেবদের এঁটো মেয়েগুলির কী দশা হয়? দশা আর কি? বাজার খোলা।

ভাবতেও কনকের গা শিউরে ওঠে। আজ যে তার এত নাম, ডাক, টাকা, পয়সা—কোথায় থাকতো এসব? আর জোসেফ!! কী ভালো! কী চমৎকার! এমনটি আর দেখেনি কনক। তা রুথের কাছে কি একবারও সাহেবের নাম করবার জো আছে? নামটা কানে এলেও ভির্মি খায় সে। কী মেয়েই যে হয়েছে!

রুথ কি কনককে ভালবাসে? বাসতে কি পারে? এই যে ঝাউগাছটার তলায় চৌকি পেতে বসে বই পড়ছে রুথ—দেখে কি কেউ বলতে পারবে সে কনকের মেয়ে?

ওমা! চমকে উঠলো কনক। তপনবাবু যে!! তপনকে বড় ভয় পায় কনক। রাগ করেনা, মন্দ বলেনা, কিন্তু মানুষ বলে একবার চেয়েও দেখেনা। না দেখলো কনককে, কিন্তু রুথকে একবার দেখেনা কেন? রুথকে যে উইলির হাত থেকে বুকে করে টেনে নিয়ে এল তপন—সে তো ছবি হয়ে রয়েছে কনকের মনে। বিপদ কেটে যেতে, কত আশা জেগেছিল তার মনে। কিন্তু না মেয়ে, না তপন—কারো কোনো পরিবর্তন চোখে পড়লো না কনকের।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আরভিং সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বাড়ী ফিরছিল তপন। আগামীকাল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ। মিশন-স্কুলের ছেলেদের সিট পড়েছে নবকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে। এখান হতে অনেকটা দূর। তাড়াতাড়ি ছেলেদের রওনা হতে হবে। টিফিনের ব্যবস্থা স্কুল থেকে করা দরকার। ছেলেদের বাবারা তো

অধিকাংশই ডকের মিস্ত্রী। সপ্তাহে চার টাকার বেশী কেউ পায়না। ছ'বেলা ভাত জোটাই মুশ্‌কিল, টিফিন দেবে কোথা হতে? বেশী বললে হয়তো র'-চা আর আধপয়সার একখানা 'কুকিস' বিস্কুট নিয়ে হাজির হবে। আরভিং-এর সঙ্গে এসব আলোচনা করে বাড়ী ফিরছিল তপন। সুরেন, প্রাণমোহন আর যিশুধন— এরা তিনটিই ভালো ছাত্র। ফার্স্ট ডিভিসন আটকাবে না। যিশুধন অঙ্কে লেটারও পেতে পারে।

সামনে তাকিয়ে তপনের চিন্তায় বাধা পড়লো। রুথ। এগিয়ে গেল তপন। রুথ উঠে দাঁড়ালো।

—'কি পড়ছো? অভিজ্ঞানশকুন্তলম্? ও। এই জায়গাটা? এটা বেশ সুন্দর বর্ণনা। দুষ্মন্ত আড়াল হতে দেখছে···'

থমকে গেল তপন। কাকে বোঝাচ্ছে! সংস্কৃতে রুথ তপনের চেয়ে অনেক ভালো। লেটার ছিল—ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায়। হেসে ফেললো তপন—'দেখো মাস্টারি ক'রে ক'রে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ভুলেই গেছি, তুমি বরং সংস্কৃতে আমার মাস্টার হতে পারো।'

রুথের মুখেও হাসি ফুটলো, কিন্তু চোখ তুলে তাকালো না সে।

—'তুমি শকুন্তলার একটা ছবি এঁকেছিলে বলে মনে পড়ছে যেন?'

পাছে অতীতের আর কিছু মনে পড়ে যায় সেই ভয়েই রুথ যেন তপনকে আর কিছু ভাবতে সময় দিলো না। বললো—'হ্যাঁ। শকুন্তলা যাত্রার জন্য প্রস্তুত, হরিণের বাচ্চা আঁচল ধরে টানছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক। আচ্ছা, চলি। দেরী হয়ে যাচ্ছে। কাল তো ক্রস্টাবেল? কেমন লাগছে ভূতের গল্প?'

চলে গেল তপন। মিলালো সে। ফুরিয়ে গেল গলার স্বর, পায়ের শব্দ। সত্যি কি ফুরিয়ে গেল?

'Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory ;'

কথার সুর, পায়ের শব্দের সুর মিলায় না। মিলাতে পারে না। বুকের মধ্যে বাজছে অহরহ। বাজবে। আরো কতদিন বাজবে ? রুথ বুড়ী হবে। বুড়ী হবে রামায়ণের শবরীর মতো, কিন্তু কেউ তার জন্য আসবে না। কেউ না। শবরী—শবর-কন্যা, তবু সে আর রাম এক জাতের মানুষ। শূর্পণখা—রাক্ষসী। তাইতো তার ভালবাসা হলো রাক্ষসীর কাম। প্রেম, প্রীতি, অনুরাগ—এত সুন্দর নামগুলির একটাও তার জন্য নয়। শূর্পণখার অনুভূতির নাম ক্লেদাক্ত, পঙ্কিল, পিচ্ছিল—দেহজ লালসা।

আর রুথ তো শূর্পণখার চেয়েও নিকৃষ্ট। সে কি ?

সে কি খ্রীষ্টান ? তার কি কোন ধর্ম আছে ? সে তো এডওয়ার্ড ডি'সিলভার ছেলের আয়ার গর্ভে জন্মেছে ! তাইতো উইলিয়াম ডি'সিলভা সম্পর্কের বাধা উড়িয়ে তাকে লুট করতে আসে। ভদ্র খ্রীষ্টান সমাজে তার জায়গা নেই। রবিবারের চার্চে নিজেদের 'পিউ' ছেড়ে যখন জোন্স, আলফ্রেড অ্যাংলোগুলো তার চারপাশে ভিড় জমায়, তখন প্রতিবাদ জানায় না কেউ। আদিবাবুর মেয়েরা নাক কুঁচকে সরে বসে।

সবুজ ধানক্ষেত আর লাল সুরকির পাড় বোনা নদীর তীরে তীরে, অশোক-বকুল-ঝরানো রাস্তা ধরে, তপন বাড়ী ফিরছিল। বড় দেরী হলো। মা নিশ্চয় অনেকবার গেটের জাফরি ধরে উঁকি মেরে পথ দেখে গেছেন। কাল ছেলেগুলোর পরীক্ষা। ইংরেজী। ইংরেজীতে কাঁচা ছেলেরা। অঙ্ক ভালই পারে। রুথের পরীক্ষারও আর দেরী নেই। ও ভালোই করবে। যেমন বুদ্ধি মেয়েটার তেমনি নানা গুণ। উইলিয়াম ডি'সিলভাটা কী

পাজী! ভালো লাগছে,—বিয়ে কর্—তা নয়—অপমান। দেশী মেয়েদের ওরা মনে করে কি? অবশ্য রুথকে ডি'সিলভা বিয়ে করতে পারে না। গোলমাল? হ্যাঁ, গোলমাল আছে. ওদের সম্পর্কের মধ্যে। আর উইলিয়ামের তো বিয়েই হয়ে গেছে গতবছর জুন মাসে। হ্যাঁ, জুন মাসেই তো। কত বাজি পুড়েছিল। সেদিনই দাদার প্রথম চিঠি এসেছিল। ঠিক তেরো বছর পরে প্রথম খবর, আর ভালো খবর। ভালো আছে। চাকরি করছে মেসোপটেমিয়ায়—কমিসারিয়েটে। এখন তো প্রতিমাসেই টাকা আসছে। চিঠি লিখছে। কবে এখানে ফিরে আসবে কে জানে! সব দায়িত্ব নিয়ে চলতে তপনের আর ভালো লাগছে না। বিলু দিন-দিন দুষ্টু হচ্ছে। মায়ের কলিকের ব্যথা। ঠাকুমা-বুড়ী পটল তুললেই হয়। জমি-জায়গা—নানা ঝঞ্ঝাট। দাদা এলে সোজা চলে যাবে ক'লকাতা। এম. এ-তে ভর্তি হবে, আর ল'। রুথও বি.এ. পাস করে অক্লেশে এম.এ. পড়তে পারে। বেশ সুন্দর দেখতে মেয়েটা!

বাঃ, বাড়ীর দরজায় পৌঁছে গেছে তপন। ঠিক যা ভাবছিল—মা দাঁড়িয়ে,—সামনে পথের ধারে। সেই মধুর পাণ্ডুর মুখ, বাঁকানো ভুরু, ছলোছলো চোখ। এত ভালো লাগে মাকে! এক ঝট্‌কায় দরজা খুলে মাকে জড়িয়ে ধরলো তপন—'ভাবছিলে তো?'

মা হাসলেন। মা কখনো কিছু বলেন না। শুধুই হাসেন। হাসি দেখেই তাঁর ছেলে-মেয়েরা বুঝে নেয় কোন্‌টা দুঃখের, কোন্‌টা রাগের আর কোন্‌টা আনন্দের হাসি। ডি'সিলভার সঙ্গে ঝগড়া হবার পর হতেই মায়ের বড় ভয়। যদি গুণ্ডা লাগায়! গুলী করে যদি উইলিয়াম! যে পাজী! সব করতে পারে। তাইতো ছেলেদের বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হলেই মা ছট্‌ফট করতে থাকেন।

সবাই বলে—'ছেলের বিয়ে দাও মনার মা, অমন রাজপুত্রের মতো ছেলে!'

বিয়ে দিতে তো ইচ্ছে করেই। বিয়ের বয়স তো হয়েছে তপুর। কিন্তু সুমন যে আসেনা। সে যে বড়। আগে যে তার কল্যাণে শ্রী গড়বেন মা। কত ইচ্ছা, সুমন-তপনের বিয়ে হবে। উঠান-জোড়া বউছত্র। জোড়া-জোড়া নতুন শাড়ি পাড়িয়ে দুই বউ ঢুকবে ঘরে, হাতে থাকবে জ্যান্ত মাছের ডালা। কানে ঠোঁটে, মধু ক্ষীর। বোনঝি শান্তি আর মেয়ে দলনী করবে এয়ো-কাজ। শাশুড়ী সোনা-মোড়া লোহা দিয়ে বউ পরিচয় করবেন। আর নিজে? মা তখন কি করবেন? মা তখন একছুটে পালিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করবেন শোবার ঘরের। সেখানে আছে 'তাঁর' বাঁধানো ফটো। মস্তবড় ছবি। তাঁকে বলবেন—'করেছি তোমার দেওয়া সব কাজ শেষ। সুমন-তপনের বউ এসেছে, বড় হয়েছে বিলু। এবার তবে নিয়ে যাও তোমার কাছে। বারো বছরের মেয়েকে এনেছিলে,—তাকে ছেড়ে গেছো। কত বছর কেটে গেলো, আরো কি একা থাকতে পারি আমি? কি করে আছ তুমি আমায় ফেলে?'

॥ আট ॥

হরিশ খাচ্ছে। মিশনের ওয়াচার হরিশ। ক'মাস হলো তার বিয়ে হয়েছে, মনোরমা ঘর করতে এসেছে, কাজকর্মেও লেগে গেছে। আঠারো বছরের মেয়ে মনোরমা। ইস্কুলে পড়ায়। গান, সেলাই সব জানে, ইংরিজিও। কতদিন হরিশের ঘর বলে কোনো পদার্থ ছিল না। খৃষ্টান হবার আগে অবশ্য ডেরা, দাণ্ডা সবই ছিল। বাপ মা ভাই। বউ? শোনো কথা! তিরিশ বছরের ডাঙ্গর মানুষটার বউ না থেকে পারে নাকি? বউ, একটা হামা-টানা ছেলে, সব ছিল। কিন্তু কিবা সেই বউয়ের রূপ আর কিবা গুণ! হরিশেরও তখন সেই অবস্থা। নেংটি পেঁচিয়ে হাল মারছে, জাল মারছে। কে বলবে সে মানুষ না পশু। অনেক-দিন হতেই তার যিশু ভজ্‌বার ইচ্ছে ছিল। হাটবার হাটবার তাদের গাঁয়ে যেতো তো লালমুখো পাদরী সাহেব। বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে সেকি বক্তৃতা! হুড়মুড় করে বাংলা বলতো, ঠাকুর দেবতাদের বাপান্ত করে ছাড়তো। প্রথম প্রথম ঠাকুরদের নিন্দে-মন্দ শুনে আর সবার মতই হরিশও রাগতো, জানতো সাহেবের কাল ঘনাতে দেরী নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য! একটি চুলও খসলো না পাদরীর, হেন দেবতাদের গালাগালি করেও। আর হরিশদের বেলা? পান হতে চুণ খসলো তো নাকমলা খাও, কানমলা খাও, দণ্ডী খাটো। ঠাকুরমন্দিরে জরিমানা দাও সওয়া পাঁচ আনা। আর পুরুত ঠাকুরের কি বকুনি! ধেৎ তেরি তোর হিঁদুর ঠাকুর! সেও ভয় পায় রাজার ধর্ম্মের দেবতাকে। আর হিঁদুর পুরুত তো কেঁচো, খৃষ্টান পুরুতের কাছে। আরে

ঐ পাদরীই তো পুরুত, যার নাম পেঁয়াজী তাকেই বলে তেলে-ভাজা। তা বেশ ধর্মটি খৃষ্টানদের।

একটু একটু করে হরিশ আকৃষ্ট হতে লাগলো। মিশনারীও লক্ষ্য করলেন তার ভাবান্তর। একটি হিন্দুর খৃষ্টান হওয়া তাঁদের কাছে একটি রাজ্য জয়ের সামিল। উঠে পড়ে লাগলেন পাদরী সাহেব। কানাকানি হতে হতে কথাটা গিয়ে পৌছালো পাঁচু পোদের কানে। পোদ-গিন্নী বউ নিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়লো ঠাকুরের থানে। দয়া করো দেবতা! মতিগতি বদলে দাও হরিশের। ডব্‌কা বউটার চোখে শ্রাবণের ধারা। পুরুত মশাইয়ের পরামর্শে হরিশকে চাবিবন্ধ করলো বাপ। কিন্তু পারবে কেন সাহেবদের সঙ্গে? পাদরী নিজে চলে এলেন হরিশের বাড়ী। লালমুখ টকৃটকে আগুন রাগে। সঙ্গে লাল পাগড়ী। বেঁধে নেয় আর কি পাঁচুকে! হাতে-পায়ে পড়ে তবে রক্ষা। সেই চলে এলো বাড়ী ছেড়ে হরিশ। তারপর খৃষ্টান। কষ্ট কি হয়নি বাড়ী ছাড়তে? হয়নি? বাপ মা, স্ত্রী হেন পদার্থ আর ছেলে? সেই কালো কালো দুষ্টুটা! এদের ছেড়ে আসতে কার না বুক ফাটে? খৃষ্টান হতেও রাজী হয়নি প্রথমে। ভেবেছিল, যা হয়েছে, হয়েছে। গোবর খেয়ে, মাথা মুড়িয়ে ফের জাতে উঠবে। কিন্তু তার উপায় নেইতো। সাহেব বললো তাহলে ফাটকে যেতে হবে। খৃষ্টানধর্ম, বাপরে, রাজার ধর্ম! তাকে নেবোনা বলে পিছিয়ে গেলে, অপমান রাজার। তাই একবার সাহেবদের কাছে এলে আর ফেরা যায় না। দিবা রাত্রি বুক হু হু করতো হরিশের। মনে পড়ে লেপা-পোঁছা উঠানে শীতের রোদে বসে খলসে মাছ পাতুরি আর এক কাঁসি কড়্‌কড়ে ভাত। ঘোমটা-টানা বউটা, ছেলে, মা-বাপ, গাঁও ঘর কোনটাইবা কম! সাহেব-দের জাতে এসবার শাস্তি ও কি কম! রোজ জামা কাচো, সাফ হও, রবিবার রবিবার চার্চে গিয়ে শোনো নাকীসুরের গান।

যাক এখন মনোরমাকে পেয়ে তার প্রাণটা কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে! তার কোয়ার্টারে নিয়ে এসেছে মনোরমাকে। বেশ বড় সব শান-বাঁধানো ঘর। এক চিলতে বারান্দা। ঘরে টেবিল আছে, চেয়ার আছে। সেই টেবিলে লেসের পাড়-বসানো ঢাকনা বিছিয়েছে তার 'ওয়াইফ'। খৃষ্টানদের বউকে 'ওয়াইফ' বলতে হয় কিনা! তারপর টেবিলে রেখেছে কাঁকুই, পাউডারের কৌটো আর চীনামাটির ফুলদানীতে একগোছা ফুল, জানালা-দরজায় পর্দাও ঝোলানো হয়েছে। বেশ, বেশ সাজানো হয়েছে ঘর! কিন্তু কোথায় যেন খুঁতখুত করছে হরিশের মন। ঘরখানা যেন থাকবার ঘর নয়। সাহেবদের কেলাব কেলাব মনে হচ্ছে। ঘরে মানুষ বসবে, দাঁড়াবে। হাঁটুর কাপড় আরো উপরে ঠেলে দিয়ে চৌকিতে নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে আরাম করবে, কিন্তু এই ঘরে কি তা হয়? এমন সাজানো-গোছানো ঘর! এ যেন মিশনের এক অফিস ঘর হতে আরেক ঘরে ঢুকছে এসে হরিশ।

তারপর বউ। মনোরমাকে বিয়ে করবার সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হয়েছে হরিশ। লম্বা বেনী, তার ডগায় লাল ফিতের ফুল। চটি পায়ে, হাঁটে ফটর ফটর। রং? রংও ভালো। ওকি আর রুথের মত দুধে-আলতায় হতে পারে? অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে মনোরমাকে ঘরে আনলো হরিশ, কিন্তু মন তো ভরছে না। ধুত্তোরি! খৃষ্টানদের আবার ঘর! তাদের আবার বউ! ঘরে থাকবে না লক্ষ্মীর পট, উঠানে চলবে না তুলসীগাছ। বউয়ের কপাল খাঁ খাঁ করবে, ছিটে রত্তি সিঁদুর উঠবে না, হাতে থাকবে না এক-রত্তি লোহা। অবশ্য মনোরমা তো হিন্দু বউ নয়, খৃষ্টান ওয়াইফ। ওয়াইফের সঙ্গে সমীহ করে কথা বলতে হয়। স্যামুয়েল শিখিয়ে দিয়েছে—গেঞ্জি খুলোনা, তুলোনা হাঁটুর কাপড়।

খরচটা যা হচ্ছে হরিশের তার ঠিক ঠিকানা নেই। মনের আনন্দে দরাজ হাতে বিয়ের বাজার করেছিল হরিশ। কমলা

রং-এর কনে-ভেল পর্য্যন্ত কিনেছে। এখন হিসেব করে দেখছে, জমানো টাকা সব হাওয়া।

আর মনোরমা কি তার দুর্গাবালা বউ যে আধমণ ধান কুটবে রাত থাকতে উঠে, তারপর আখা জ্বেলে বসবে ভাত রাঁধতে? এ অন্য রকম। ইস্কুলে যায় বেলা দশটায়। বিকেলে বাড়ী ফিরেই নিত্যি মাথা ধরবে মনোরমার। গন্ধ-জলে একরত্তি রুমালের তেনা ভিজিয়ে কপালে দিয়ে, চোখ বুজে এলিয়ে পড়বে বিছানায়, ঠিক যেমনটি দেখা যায় সিমন্ সাহেবের মেমসাহেবকে; তখন হরিশকেই বানাতে হয় চা, রাঁধতে হয় রাতের ভাত। দিনের রান্না অবশ্য মনোরমাই করে।

প্রথম প্রথম মন্দ লাগতো না হরিশের। মনোরমা যেন এক-টুকরো চাঁদের কণা। তেমনি আলো-করা, তেমনি দামী। কিন্তু ছ'মাস ঘর করে হরিশ বুঝেছে অমন দামী পদার্থে তার কাম ছিল না! সে জোয়ান হরিশ পোদ। মিশনের ওয়াচার। মায়না পায় কুড়ি টাকা। ঘর ভাড়া লাগে না। কোয়ার্টার্স পাচ্ছে। একা মানুষ। ভালোই চলতো। এখন দোকার খরচ! মনোরমা ইস্কুলে কত পায়, ঈশ্বর জানেন। জিজ্ঞেস করতে সাহস নেই হরিশের। তা সৌখিন খরচ-পত্র সব মনোরমাই করে। কিন্তু ডাল-ভাতের খরচ তো হরিশের। হাতে একটি পয়সাও থাকছে না।

আজ রবিবার। রেঁধে বেড়ে মনোরমা গিয়েছিল চার্চে। হরিশও। এখন বেলা একটা বেজে গেছে। বড় ক্ষিধে পেয়েছে তার। আরো আগেই খেতে পারতো সে, কিন্তু বিশ্রাম-টিশ্রাম না করে নাকি খাওয়া নিয়ম নয়। কত যে নিয়ম আছে খৃষ্টানী শাস্ত্রে। রবিবারে নিশ্চয় চার্চে যাবে, ফুল ভালোবাসবে, 'আপনি', 'আজ্ঞে' আর 'ধন্যবাদ' বলে কথা কইতে হবে

থাক্‌গে। এখন খেতে বসেছে হরিশ। রাঁধে মনোরমা ভালোই। তা বলে কি মায়ের মত? দুর্গাবালার মত? সেই বেলে মাছের চচ্চড়ি, চিংড়ি-তেঁতুল! তার স্বাদই আলাদা। আর ক্ষেতের সদ্য-ভানা চালের গন্ধ। থাক্‌গে, থাক্‌গে। মনে মনে দিবা রাত্রি মাথা কুটছে হরিশ মা কালীর পায়ে,—সামনের জন্মে যেন ফের জন্মায় হিন্দু হয়ে, এমন মতিভ্রম যেন আর হয় না। একপাল ছেলেমেয়ে আর দুর্গাবালাকে নিয়ে যেন দুঃখের ভাত, সুখে খেতে পারে। এবার? এবার ছেলে হবে? ওরে বাবা! মনোরমা রাজী হবে ছেলেপুলের হাঙ্গামা পোয়াতে? তারপর খৃষ্টান ছেলে! রক্ষে কর বাবা!

হাঁটু উঁচু করে মনের সুখে খাচ্ছে হরিশ। খৃষ্টান হবার পর এই একটি সুখই আছে তার। মনোরমা খেতে বসেনি। হরিশের সঙ্গে বসে খেতে ভালো লাগেনা তার। একটু সরে বসে হরিশের খাওয়া দেখছিল সে। প্রকাণ্ড হা। বিরাট বিরাট গ্রাস তার গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। চোখ বিস্ফারিত, কণ্ঠমণি ঠেলে উঠছে। একসের চালের ভাত খায় হরিশ। কালো কুচকুচে রং। চার্চে যাবার সময় বুঝি পাউডার মেখেছিল। এখন ঘামে ভিজে তা সারা মুখ ময় সাদা ফুট্‌কি তুলেছে। স্বামীর দিকে চেয়ে সমস্ত মন সঙ্কুচিত হয়ে এলো মনোরমার। স্বামী। মিশনের চৌকিদার, চল্লিশ বছরের হরিশ তার স্বামী। সবাই বলবে স্বামী বলে ওকে যে সুখ পাবেনা সেতো জানা কথা, বিয়ে করতে রাজী হলে কেন! সেই তো কথা। রাজী হবেনা? না হলে তো থুবড়ী হয়েই থাকতে হতো তাকে,—বুড়ী দিদিমণি।

ঘর নেই, সংসার নেই, ছেলেপুলে নেই, আছে এক ইস্কুল আর খিট্‌খিটে মেজাজ। তাদের মধ্যে ছেলে ছিল না হরিশ ছাড়া? যোগ্য, অন্তত অল্প বয়সের? কত ছেলে আছে। কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখেছে। কিন্তু তারাতো সাহেব। ডকে,

ষ্টীমারে চাকরী করে,—কেরানী। লাঞ্চ, ডিনার খায়। ইংরেজীতে কথা বলতে চেষ্টা করে। নজরও তাদের উঁচু দিকে। তারা বিয়ে করবে গাউন-পরা, বব-ছাটা অ্যাংলো মেয়ে। প্রমোশন পাবে এক ক্লাশ উপরে। চাপরাশীর মেয়ে বিয়ে করবে তারা? তাই কখনো কেউ করে? আর হরিশের সমপর্যায়ভুক্ত অল্প বয়সী ছেলেগুলো মহা পাজী। তাদের তুলনায় বরং হরিশ ভালো। মদ ছোঁয়না। মিশনের কাজে থেকে উচ্ছৃঙ্খল হবার সময়, আর উপায় কই? সবদিকে ভালো করে বিবেচনা করে. তবেই হরিশের প্রস্তাবে রাজী হয়েছে মনোরমা। ছিম্‌ছাম গুছানো, মিশনের শান্তির মধ্যে সংসার। আরাম, বিরাম, রোগের আশ্রয় একটা মানুষ। আর? আর, ক'দিন পরতো আসবে ছেলে-মেয়ে। তারাই সব দুঃখ মুছে দেবে মনোরমার। সানি, স্বপ্নার মত, দেবশিশুর মত না হলেও তারো হবে টমেটো-গাল দুটো বাচ্চা। লাল রিবন, হাফপ্যাণ্ট। তারা লেখা-পড়ায় খুব ভালো হবে, বড় ইস্কুলে পড়ে বড় হবে।

ঢক্ ঢক্ ঢক্। বুঝি এক কলসী জলই খেয়ে ফেলছে হরিশ। তৃপ্তির উদ্গার। ভাবনা ভাঙ্গলো মনোরমার।

—'তুমি খাবে না?'

হরিশের কথার উত্তর না দিয়ে, লতানো আঙ্গুল দিয়ে হরিশের থালা তুলতে লাগলো মনোবমা।

দেখে দেখে মায়া লাগে হরিশের। ভাগ্যিস সে খৃষ্টান হয়েছিল, হিন্দু থাকলে, মনোরমা কি বউ হয়ে তার সংসার ঠেলতে পারতো! ভরন্ত সংসার।

—'একি শিশুবালা, এত রোদে কোথা হতে?'

মনোরমার কথা শুনে ফিরে চাইলে হরিশ। শিশুবালা জানি-মেমসাহেবের আয়া। দুপুরের রোদের আঁচে কালো মুখ আরো কালো। হাতে সুন্দর কাগজ-জড়ানো একটা প্যাকেট।

—'আর রোদ! বাড়ী ফিরছিলাম। মেমসাহেব বল্লেন তোমার জন্য কেক রেখেছেন, চায়ের সঙ্গে দুজনে খাবে। নাও, ধর।'

—'বাঃ, কি সুন্দর!'

কাগজ উন্মুক্ত হয়ে দেখা দিল ছোট একটি কেক, কিস্‌মিস্‌-বাদামে মাখামাখি।

হরিশের হাসি পেলো। এত্তটুকু, একরত্তি কেক, তা আবার সুন্দর, দুজনে খাবে। এক হরিশের মুখে পুরে দিলেই কোথায় যে তলিয়ে যাবে, তা সে নিজেই টের পাবেনা, তা আবার কাটো, ভাগ কর। অবশ্য মনোরমার খোরাক খুবই কম। কাঁচের বাসনে খুটে খুটে এক চামচে খায় কি না খায়।

—'তোমার এখনো খাওয়া হয়নি দিদি?' মোড়ায় বসে তালপাতার পাখা নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করলো শিশুবালা।

—'এইবার খাবো। তুমি যে আজ দুপুরে বড় বাড়ী আছ? রবিবারের দুপুরে ছুটী দেন বুঝি মেমসাহেব?'

—'ছুটি! হুঃ, কুঁজো শোবে চিৎ হয়ে, পেয়াদা যাবে শ্বশুর বাড়ী! দুপুরে বলে একতিল গড়াতে দেয় না, তার দেবে বাড়ী যেতে! ঝাড়া, মোছা, কত কাজ। যে পিত্‌পিতে জানি-মেম। বামুন ঘরের বিধবার বাড়া। এ পরিষ্কার হলো না, ও নোংরা রইলো। ঢালো জল, দাও ফেনাইল। কত বায়না। আজকে ছুটি নিয়েছি চেয়ে চিন্তে। বৌটার বড় ব্যামো হয়েছে। ওষুধ-পত্র করতে হবে। কুটুমের সঙ্গে একটা পরামর্শও আছে।'

—'পরামর্শ আবার কি? ডাক্তারবাবু যা বলবেন, তাই করো।'

—'ডাক্তারে-রোগে বউরে ধরেনি গো দিদি। ডাক্তার ভালো করতে পারবে না।'

—'সেকি!'

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে ভুলে গেল মনোরমা।

—'তাইতো বলছি। বিপদ বড় বেশী। বৌকে ডাকিনীতে পেয়েছে।'

—'ডাকিনী! যাঃ।'

হাসলো মনোরমা।

—'তুমি ওসব বিশ্বাস কর নাকি?'

—'বিশ্বাস? আমি? শুনলে তোমার বউয়ের কথা হরিশ-দাদা? জগৎ-সংসার বলে ডাকিনী মান্‌ছে, আমি কোন ছার। তারপর, কপাল দোষে, বুদ্ধির ভুলে, নয় তো খৃষ্টানই হয়েছি। তা-বলে কি ঠাকুর দেবতা সব মিথ্যে হয়ে গেছে?'

শিশুবালার সমর্থনে জোরে মাথা নাড়লো হরিশ। -–'মিথ্যে! আছেন সবাই জল-জ্যান্ত। মনোরমা ইংরেজী পড়েছে কিনা, ওর মেজাজ-পত্তরই আলাদা। ওর কথা বাদ দাও। তা বৌয়ের এই বিপদের নিবারণ কি করে করবে, ঠিক করেছ?'

'ঠিক আর কি দাদা। মা চণ্ডীর পূজো দিয়ে সেই চন্নামেত্ত ছাড়া, ওষুধ আর কি এ-রোগের বল?'

আবার মাথা নাড়লো হরিশ।

—'তাতো নেই, কিন্তু মায়ের পূজোটা দেবে কি করে?'

—'ঐতো পরামর্শ। স্বোয়ামী তো জাতের মাথা খেয়ে খৃষ্টান হয়েছিল। স্বর্গে গেছে, না গোরস্থানে পড়ে আছে এখনো, কে জানে! এখন যত দায় আমার। ধরেচি আহ্লাদি দিদিকে। আমার মাসতুতো বোন। তার মানুষও মতিগতির তাল পাকাচ্ছিল, কিন্তু বোন আমার শক্ত মেয়ে। গরুর পাচনবাড়ি দিয়ে এমন ঠেঙ্গালো যে তিনমাস শয্যাগত। ব্যস! মতিগতি ফিরে গেল। আর খৃষ্টান হয়? এখন সেই বোনই ভরসা। তাকেই পয়সা গছিয়ে দেবো। বলেছি মহাপাপের ফলে দেবতার পা-ঠেলা হয়েছি। তুই বোন হয়ে রক্ষে করবি নে? তা সেও রাজী হয়েছে। রাগী মানুষের মন বড় ভালো হয়গো হরিশদাদা।

বলেছে—পূজো দেবে বৌয়ের কল্যাণে। তবে সবই সারতে হবে খুব চুপি চুপি। জানাজানি হলে আবার বিপদ জানো তো?

চোখ মুখ কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে বিপদটা বুঝিয়ে দিল শিশুবালা।

বিপদের কথা হরিশ বুঝেছে। এসব পূজো-টুজোর কথা শুনলে রক্ষে রাখবে না ফাদার। একুল-ওকুল দুকুল হারিয়ে ভাতের অভাবে মরবে শিশুবালার সংসার!

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে সামনে দাঁড়ালো মনোরমা।

—'তোমার বৌয়ের কি কষ্ট?'

—'কষ্ট? কষ্টের আর শেষ নেই বউটার। ঠাঁই নেই, অঠাঁই নেই, দড়াম্ করে আছড়ে পড়ছে, চুল ছিড়ছে, হাত-পা ছুঁড়ছে। মুখে গাঁজলা, গোঁ গোঁ রব। দিনের মধ্যে পাঁচ ছ'বার হচ্ছে এমনটা। সব ডাকিনী পাওয়ায় লক্ষণ।'

—'তা একবার ডাক্তারবাবুকে দেখাতে?'

—'ডাক্তাররাবু করবেটা কি শুনি?'

এবার রাগলো শিশুবালা।

—'বোতল বোতল ওষুধ, নয়তো দেবে গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে। টাকার ছাদ্দ। তুমি সেদিনের মেয়ে, বুঝবে কি এসব, জিজ্ঞেস করগে তোমার মাকে। সেইতো বুদ্ধি দিলো। আমার কি আর মাথার ঠিক আছে।'

মাথায় আঁচল ভুর করে দিয়ে, রোদ আটকাবার চেষ্টা করতে করতে বেরিয়ে গেল শিশুবালা, হরিশও। মিশন-বাড়ীর গেটের ছোট খুপরিটিতে তার আস্তানা। সে যে মিশনের,—না না, চৌকিদার নয়, ওয়াচার। এত বড় বাড়ী, তার সব দায়িত্ব হরিশের উপর। তার নামেই বন্দুকের পাশ।

হালকা নীল পর্দাটা টেনে দিয়ে, একটু শুয়ে পড়লো মনোরমা।

কে জানে, সত্যি সত্যি ডাকিনীতে ধরেছে কিনা শিশুবালার বৌকে। তবে হিন্দুদের যে একটা কিছু আছে, তা সেও জানে। নয়তো নদীর ঘাটে দুর্গাপ্রতিমা দেখলে বুকটা কেমন করে ওঠে কেন? লুকিয়ে সন্তর্পণে একটা প্রণাম দিতেই হয় মা দুর্গাকে। আচ্ছা, ভাবতেই কেমন লাগে! তারাও একদিন হিন্দু ছিল। তার মা নবান্ন আর লক্ষ্মীপূজা করতেন, গল্প শুনেছে মনোরমা। আকালের বছর তার বাপ খৃষ্টান হয়েছিল। বুড়ো বাপ-মা নিয়ে সপরিবারে উপোষ করছিল মদন। চাকরির লোভ সামলাতে পারেনি, জাত দিয়েছিল। এখন মিশনের চাপরাশী। মনোরমার বড় ভাই কাজ করছে ডকে। বোন পড়ছে, ছোটভাই দুটিও।

সেও চাকরী করছে। মায়ের কাছে শোনা দুঃখের দিনের ইতিহাস। পেটে ভাত নেই, মাথায় নেই তেল। বস্ত্রাভাব। কেউ মানে না। উঁচু জাতের উঠান দিয়ে হাটলেও দূর দূর, ছাই ছাই। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যে একটু বুঝি সুখ ছিল। সুখ ছিল তুলসী-তলাটিতে দীপ জ্বেলে, লক্ষ্মীর পটখানি ফুল-চন্দনে ঢেকে দিয়ে। দেবতারা যেন সব আপন জন। দুঃখের কথা, সুখের কথা শোনাবার স্থান। সাহেবদের দেবতা সব বিদেশের আমদানী। তাদের চেহারা, কথা—সব অচেনা। সাহেবদের শাস্ত্রে প্রহ্লাদ আগুনে, সাগরে ভক্তির পরীক্ষা দেয় না; ধ্রুব বেরোয়না হরির খোঁজে। তুলসীতলায় হরির লুটও নেই। তবে কি কিছুই নেই? আছে। ডেভিড, গোলিয়াথ্, সলোমন, সব উদ্ভট্টী নামের দেবতা। মনেও থাকে না তাদের কাজ-কারবারের কথা। ওদের মেয়েরা কি যমের মুখ হতে স্বামী ফিরিয়েছে কেউ? তবে হ্যাঁ, আগুনে পুড়ে, আগুনকে তুচ্ছ করে গেছে ওদের দেশেরও এক মেয়ে। সে দেবী। উৎসব? বড়দিনে খুব উৎসব হয়। তারপর গুডফ্রাইডে—খৃষ্টের মৃত্যুর দিন। চার্চে খুব প্রার্থনা করেন ফাদার। কিন্তু মনোরমা ঠিক বোঝে, মায়ের মন ভরে না তাতে। তার নিজের কিন্তু ওসব কিছু মনে হতো

না ; বরং করুণা করতো হিন্দু মেয়েদের। পড়াশুনা হলো না, কিছু না। কেবল এক কাজ বিয়ে। ছোটবেলা ভাবতো মনোরমা কখনো বিয়ে করবে না। সুন্দর বই হাতে নিয়ে ইস্কুলে যাবে, আনমনা হয়ে, আঁচল লুটিয়ে-লুটিয়ে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু ইস্কুলে ঢুকে, আদি-বাবুর মেয়েদের দেখে ভয় হলো তার। বুঝলো কেবল পড়ানো আর ধর্ম নিয়ে মা-মণি থাকতে পারেন, সে পারবে না। বিয়ে চাই।

দুপুরের তেজ কমে এসেছে। অল্প অল্প মাথা দোলাতে লেগেছে রাস্তার পাশের ঝাউগাছ। মনোরমার চোখ ভরে আরামের তন্দ্রা এলো।

ওয়াচারের টুলে বসে হরিশও দেখছিল জেগে জেগে এক স্বপ্ন। ভারি মজার স্বপ্ন। ইচ্ছামত বানিয়ে বানিয়ে এমন স্বপ্ন সে মাঝে মাঝেই দেখে। —ও যেন ফিরে গেছে কালুখালি—ওর গাঁয়ে। খৃষ্টান হয়নি, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি হরিশ। কেবল রোজগারের ধান্দায় বেরিয়েছিল ঘর ছেড়ে। এতবছর পর তাকে পেয়ে সবার কি আনন্দ! বাপ-মা বুড়ো হয়ে গেছে? হবে না? সে নিজেইতো বুড়ো হতে চলেছে। বাড়ীর ডোবার কি ঠাণ্ডা জল! হাতে মুখে জল দিয়ে হরিশ বসেছে বড় ঘরের দাওয়ায়। মায়ের হাতে এক কাঠা মুড়ি আর আস্ত দু'খানা মুছি গুড়। ছেলেটা সা-জওয়ান হয়ে ওঠেছে। শুনছে হাঁটুমুড়ে বসে বাপের কাছে দেশ-বিদেশের গল্প। আর দুর্গাবালা! তারও কি বয়স বেড়েছে? নাকের নোলোকটির দুল্ দুল দেখা যাবে না? আড়-ঘোমটার আবডালে মুচকি হাসি, আর গোলা সিঁদুরের কপাল-জোড়া টিপ? না না, মেয়েরা অত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয় না। দুর্গাবালা ঠিক সেইরকম আঠারো বছরেরই আছে।

কি বলবে রাতের নিশুতিতে দুর্গাবালা হরিশকে? বলবে বুঝি

—'কেন গেলে আমায় ছেড়ে? দেখো দুঃখে দুঃখে আমার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।' চোখ ঝাপসা, চোখের জল ফেলে।'

হরিশ তখন মুছিয়ে দেবে সব চোখের জল। বলবে—'আর না, আর কোনদিন সে দুর্গাবালাকে ছেড়ে যাবে না। বুদ্ধির ভুলে, কপালের দোষে দূরে গিয়েছিল সে। তারও বুক পুড়ে গেছে দুঃখে। একদিনের তরেও সে তার বৌকে ভোলে নি।'

কিন্তু দুর্গা যদি জিজ্ঞেস করে—'ভোলোনি যদি, তবে সংসার করলে কেন আবার?'

ঝর্-ঝর্ করে ঝরলো শুকনো পাতা। দমকা বাতাস নদী থেকে ছুটে এসে ছুঁয়ে দিল বকুল গাছকে। চমকে গোল গোল করে চারদিকে তাকাল হরিশ। কি ভাবছিল সে? ফিরে যাবে? তাই কি যাওয়া যায়? জেল হলে খালাস পায় মানুষ, ঘরে ফেরে আবার। কিন্তু ধর্ম গেলে, জাতে উঠে ফের হিন্দু হওয়া যায় না। ফাদার বলেন—পাপী যদি অনুতাপ করে, তাহলে যিশু সব পাপ ক্ষমা করেন! সাহেবদের ভগবানের দয়ামায়া আছে। বোঝানো যায় যে ঝোঁকের মাথায় মানুষ কত কি করে ফেলতে পারে। দুঃখ হলে, তাকে তখন ক্ষমা করাই হলো উচিত কাজ। কিন্তু হিন্দুর ভগবান একেবারে পাষাণ। তাঁর কাছে ক্ষমা-টমা নেই। অন্য ধর্মের লোকের ছোঁয়া এক ফোঁটা জল গলায় তল হলো কি না হলো, অমনি ধাক্কাদিয়ে জাতের বার করে দেবে। গুরুপুরুতের দোষ কি? তাঁরা করবেন কি! শাস্ত্রে বিধান লেখা আছে যে। বড় কঠিন শাস্ত্র হিন্দুর। আগাগোড়া সমস্কৃতে লেখা। একবিন্দু বুঝবার উপায় নেই। অবশ্য খৃষ্টানী শাস্ত্র 'বাইবেল'-ও ইংরাজীতে লেখা, বুঝবার সাধ্য কই! কিন্তু সাহেবরা বাংলায় বাইবেল লিখে দিয়েছে না? সুন্দর সব বোঝা যায়। আজকেই তো রেভারেণ্ড আদিবাবু পড়্লেন যিশু খৃষ্টের কথা, দিব্যি মনে আছে হরিশের।—

"যেন তোমরা পরিত্রাণ পাও। তিনি সেই জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ময়

প্রদীপ ছিলেন, এবং তোমরা তাঁহার আলোতে কিছুকাল আনন্দ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে।" সেই স্বর্গত পিতার কথা। তিনি দীপের আলোর মত, মানুষ তাঁর আলোয় খুশী হয়। খুশীর কথা কই হিন্দুর শাস্ত্রে শোনেনি তো! কেবল বিচার, শাস্তি আর চোখ রাঙানি। ফিরে হিঁদু হওয়া যাবে না কোনোমতে। আর উপায় থাকলেও বুঝি জাতে ওঠা যেতো? মনোরমা আছে না? পরীর মত মেয়ে মনোরমা। অনেক কষ্টে ওকে পেয়েছে হরিশ। ওর উপব রাগ হয়, আবাব বড় ভালো লাগে। আর খৃষ্টান মন্দ কি! কেমন পরিষ্কার, গুছানো-পাড়া, সভ্য-সভ্য মানুষ, সভ্য কথাবার্তা, পাৎলুন, শার্ট—আর সবার উপরে—মনোরমা।

॥ নয় ॥

জগদীশবাবুর বাড়ী। ছেলেদের বোর্ডিং। বি. এম. কলেজের অনেক ছাত্র থাকে এখানে। কিছু আছে স্কুলের ছেলেও। মেয়েরা বলেন—আশ্রম। বাবার আশ্রম। রবিবার সকালে এখানে গীতা উপনিষদ, আরো কত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হয়। গিন্নী-মেয়েরা রাত থাকতে উঠে কাজকর্ম সেরে, পর্দার আড়ালে এসে বসেন। পুরুষদের মধ্যে কেবল পেন্‌শন-পাইয়ের দলই নেই ; আছেন বড় বড় অফিসার, কেরানী, ছাত্র আর তপনের মতো শ্রদ্ধাবান যুবকেরাও। প্রথমে কীর্তন। জগদীশবাবু ধ্যানমগ্ন থাকেন। গৌর-বরণ, সত্তর বছরের কুমার। তিমি যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন, সেকালের গুরুকুল হয়ে ওঠে তাঁর আসর। সারি সারি বসে আছে সব বয়সের শিষ্য; আর আচার্যের মুখে ব্যাখ্যাত হচ্ছে ধর্মের রহস্য—ঋষির ধ্যানের ধন।

জগদীশবাবু তপনকে ভালবাসেন। তপনের মা কন্যাস্নেহ পান তাঁর কাছে। 'মা' ছাড়া ডাকেননা তাঁকে। বিলুর প্রগল্‌ভতা যেমন সহাস্যে প্রশ্রয় দেন, ঠাকুমার 'স্পষ্টকথা' উপভোগ করেন তেমনি হাসিমুখে।

আজকের মতো পাঠ শেষ হয়ে গেছে। প্রচুর ঘি আর কিস্‌মিস্‌-মেশানো হাত-ভর্তি হালুয়া প্রসাদ পেয়ে, মায়েদের সঙ্গে বাচ্চারাও চলে গেছে। বয়স্কদের কেউ কেউ এখানে ওখানে ঘুরছেন।

জগদীশবাবু তাঁর ছোট খাটখানার উপর কাৎ হয়ে একটু বিশ্রাম করছেন। তপন মাকে নিয়ে এসেছিল সকালবেলা।

দুপুরটা এখানে কাটাবার সংকল্প। মা একা ফিরে গেছেন। পাড়ার চেনা কোচম্যান। দরজা-জানালা বন্ধ থাকলে কেই-বা জানতে যাবে যে শিবেশ ডাক্তারের স্ত্রী বগুড়া হতে আলেকান্দা একা পাড়ি দিয়েছে।

—'তপন কি শেষ পর্যন্ত শিক্ষাব্রতী হবে বলেই স্থির করলে?' জগদীশবাবু জিজ্ঞেস করলেন। গলার স্বর মধুর। একটু যশুরে টান, ভারি ভালো লাগে শুনতে।

তপন অদূরে বসে খবরের কাগজ দেখছিল। মুখ তুললো। —'সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন, দাদার খবর নেই। আর টাকা-পয়সা—' হাসলো তপন।—'সে তো আপনার জানাই আছে। মাত্র বি.এ. পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। দাদার কাণ্ডের জন্য সরকারী চাকরী পাবার সম্ভাবনাও ছিল না তখন। ফাদার স্ট্রং নিজে ডেকে নিয়ে গেলেন। আর একশো টাকা,—বেশ অনেকটা। মা ভালোই চালিয়ে নেন। এখন অবশ্য দাদার টাকাও আসছে।'

জগদীশবাবু একটু চুপ করে থেকে বলালন—'সতীশবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন—তপন যদি এম.এ. পাস করে আসে, তাহলে তখনি তাকে কলেজে নিয়ে নেব। আমি বলি—তুমি এম.এ.-টা দিয়েই দাও। সুমন তো আসছে, মা বলছিলেন।'

তপন বিমনা হয়ে গেল। দাদা আসবে সেই অপেক্ষাই তো করে আছে সে। কিন্তু আসছে না যে দাদা।

তপনকে চুপ দেখে জগদীশবাবু আবার বললেন—'তুমি হেমন্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পার, প্রাইভেট দেওয়া সুবিধা হবে কিনা।'

হেমন্তবাবু দর্শনের অধ্যাপক। তপন কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা পড়লো। ঘরে ঢুকলো সর্ববিজয়—তপনের বন্ধু, জগদীশবাবুর

ছাত্র। বি.এ. পাস করে, স্বদেশী টেক্‌নিক্যাল স্কুলটি বাঁচাবার ভার নিয়েছে সর্ববিজয়। জীবনযাত্রা তাতে অচল হয়ে উঠলেও আদর্শচ্যুতি ঘটেনি একতিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের ছেলে। মস্ত লম্বা-চওড়া দেহ। বাঘের থাবার মতো হাত। টক্‌টকে রং, চুলও লালচে। একটু রাগ হলেই মুখ-চোখ লাল হয়ে যায়। কামিজের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পুষ্ট বলিষ্ঠ বুক আর ধব্‌ধবে মোটা উপবীত।

সর্ববিজয়কে দেখে জগদীশবাবু উঠে বসলেন। সর্ববিজয় আর তপন এক হলে বিশ্ব জয় করতে পারে—কিন্তু একমত তারা কিছুতেই হবেনা। এত বন্ধুত্ব, অথচ প্রকৃতি একেবারে বিপরীত, রুচি-প্রবৃত্তিও। তপন মাছ-মাংসের ভক্ত, সর্ববিজয় খায় নিরামিষ। তপন ফুটবল, হকি, টেনিস—সব খেলাই ভালবাসে, খেলে। সর্ববিজয়ের খেলায় রুচি নেই, সে ভালবাসে চুপচাপ শুয়ে ইংরেজকে তাড়াবার মতলব ভাঁজতে। শুধু একটা বিষয়ে ওদের মিল। সহরে কলেরার প্রকোপ,—মহামারী। সেবা-সমিতির ছেলেরা আর পারে না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তারা ঘুমোচ্ছে। শ্রান্তি-ক্লান্তি নেই কেবল তপন আর সর্ববিজয়ের। নাগাড়ে একুশ-ঘণ্টা ডিউটী, তারপর আবার তারা বেরুচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের মুষ্টি-ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে।

রামকৃষ্ণ মিশন সহরের ঘরে-ঘরে একটা করে মাটির ঘট রেখে যায়। গিন্নীরা সকাল বেলা স্নান সেরে, চুলের ডগায় গেরোটি দিয়ে, সিঁথিতে আর শাঁখা-লোহায় সিঁদুর ছুঁইয়ে ভাঁড়ার-ঘরে ঢোকেন। মিশনের ঘটে একমুঠো চাল রেখে, তবে তাঁরা রোজকার চাল মেপে নেন। এক সপ্তাহের মুঠিতে ঘট ভরে ওঠে। রবিবার ছেলেরা নিয়ে যায় ঝুলি-ভরে। কারা পায় এসব চাল? তারা ভিক্ষুক নয়। ভদ্র গৃহস্থ। যে গিন্নীরা বাড়ন্ত হাঁড়িকে নিজের অনশন দিয়ে পুরো করে রাখতে চান, এক চিমটি চাল মুখে দিয়ে

ঢক্ ঢক্ করে একঘটি জল খেয়ে, পান আর সুপুরি-কুঁচিতে লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখেন,—ছেলেরা চুপি চুপি তাঁদেরি দিয়ে আসে মুষ্টি-ভিক্ষার চাল।

গত সপ্তাহে আশু সেনের বাড়ী চাল দেওয়া হয়েছিল। এ সপ্তাহেও তার বাড়ীতেই চাল দেবার কথা, কিন্তু আশু সেনের স্ত্রী এসে জগদীশবাবুকে বলেছে—'এ সপ্তাহে আমার আর চালের দরকার নেই, বাবা। গত সপ্তাহে ছেলেরা আমাকে বস্তাভর্তি চাল দিয়েছে—আর ওঁরও একটা কাজ পাবার কথা হচ্ছে।'

জগদীশবাবু জানেন—সে কাজ হয়তো একটা দশটাকার টিউশানি। হয়তো-বা রাতের বেলা চুপি চুপি কোনো দোকানের খাতা লেখার কাজ।

আশু সেন বি. এ. পাস। স্টীমার-অফিসে ভালো কাজ করতো। সুখে-স্বচ্ছন্দে ছিল ছেলেমেয়ে নিয়ে। ডকে হলো স্ট্রাইক। সেই স্ট্রাইকে যোগ দিয়ে চাকরী গেছে আশু সেনের। আশ্চর্যের বিষয়, স্ট্রাইকের নেতা বিনয় বোসের সেজো ছেলে কৃত্তিবাস এখন রেকর্ডবাবু, যে পোস্টে ছিল আশু সেন। একবছর হলো আশুবাবুর চাকরী নেই। কেউ বোঝেনি দিনে দিনে তাঁর অভাব কত মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। পড়শীরা দেখতো আশুর ছেলেমেয়েদের ধব্ ধবে জামা। আশুর স্ত্রীর কপালে মস্তবড় টিপ। মুখভরা পান আর হাসি। একটু যেন রোগা হয়ে যাচ্ছে বউটা। সমবয়সীরা ইঙ্গিত করে হাসতো,—কোলেরটার বয়স তো তিন ছাড়িয়েছে কবেই। সেন-বউও হাসতো। প্রশ্রয়ে বেড়ে যেতো বান্ধবীদের প্রগল্ভ পরিহাস।

দুর্গাপূজার বিজয়ার দিন। ছেলেরা গেছে ভাসান দেখতে নদীর পাড়ে। জগদীশবাবু ঘরে বসে হয়তো নিজের শৈশবের

বিজয়া স্মরণ করছিলেন। মাথায় আধ-ঘোমটা টেনে আশুর বউ তাঁর পায়ের কাছে পড়লো। ব্যস্ত হলেন জগদীশবাবু।

—'কি মা? কেন মা? বাড়ীর সব ভালো তো?'

—'ভালো।' বললো সুখলতা, আশু সেনের বত্রিশ বছরের স্ত্রী। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। সচরাচর হাসিখুশি, একটু বা উচ্ছল সুখলতাকে দেখতেই অভ্যস্ত জগদীশবাবু আশ্চর্য হলেন আজকে তাকে দেখে!

—'সবাই ভালো আছে। আবার বললো সুখলতা। কিন্তু মানিক আর মনু বোধ হয় মরে যাচ্ছে।'

—'সেকি! কী অসুখ? আগে খবর দাওনি কেন?'

—'অসুখ নয়, বাবা। আজ চারদিন ওরা শুধু কচুর শাক সিদ্ধ খেয়ে আছে। আজ কেবল তাই বমি[illegible] উঠছে কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে।'

জগদীশবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

—'বাড়ী যাও, বাড়ী যাও, মা! আমি এখুনি আসছি।'

কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলো সুখলতা। ও বোধ হয় চারমাসই কচুর শাক খেয়ে আছে।

এর পর হতেই আশু সেনের সংসারের ভার নিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের ছেলেরা। কিন্তু সুখলতার বড় মর্যাদা-জ্ঞান। সেলাই ফোঁড়াই করে সে কিছু কিছু উপার্জন আরম্ভ করে দিয়েছে। আশু সেনের একটা কিছু আয় হবার সম্ভাবনা-মাত্রেই সাহায্য অস্বীকার করছে সুখলতা। জগদীশবাবু খবর পেয়েছেন লাখুটিয়া স্কুলে একটা মাস্টারি খালি হয়েছে। চেষ্টা করলে হয়তো আশুর হয়ে যাবে। লাখুটিয়া বড় দূর। এতদূর এখন আর হেঁটে যেতে পারেন না, বয়স হয়ে গেছে। তারপর কাজটা যদি ইতিমধ্যে হয়ে গিয়ে থাকে, তাঁর অনুরোধ রাখতে না পেরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন স্কুলের সেক্রেটারি যোগেন্দ্র বসাক।

লাখুটিয়া যেতে পারে সর্ববিজয়। লম্বা লম্বা পা ফেলে এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। বসাকমশাইকে ধরতে পারলে ছাড়বে না সহজে সে। কিন্তু সর্ববিজয়ের বড় রাগ। হয়তো বা চটেমটে বসাকমশাইকে এমন কথা বলে ফেলবে যে, এখন তো কাজ হবেই না, ভবিষ্যতের পথও যাবে বন্ধ হয়ে। তপনের ভালো মেজাজ। তার কথাবার্তা চলে যুক্তির পথ ধরে। তাকে ফেরানো শক্ত। দুজনে গেলে কাজটা হয়।

জগদীশবাবুর কাছে সব শুনে সর্ববিজয় তক্ষুণি ছুটতে রাজী।

—'কি যে বলেন, স্যার! খাওয়া-দাওয়া। হুঃ!! খেয়ে ঘুমিয়ে বসাকের বাড়ী যেতে হলে তার মধ্যে অন্য লোকের চারবার চাকরী হয়ে যাবে। চল্ তপন। বুড়োকে গিয়ে ঠিক একটার সময় ধরবো।'

তপন উঠবে কিনা ইতস্তত করছিল। জগদীশবাবু বল্লেন—'না না, এখন যেওনা। বুঝলে না? খেয়ে ঘুমিয়ে উঠলে তবেই তো বসাকের মেজাজ ভালো থাকবে। রাজী করাতে পারবে সহজে।'

—'রাজী?'—গর্জে উঠলো সর্ববিজয়। —'রাজী না হয়ে যাবে কোথায় বুড়ো? সোজা মাথা ফাটিয়ে দেবো না!'

মৃদু হেসে তপন বললো—'তাতে কিন্তু আশু সেনের চাকরী হবে না। বরং টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল আবার সার্চ করে তোর উজির-পুরী দা' বঁটি বেমালুম সরিয়ে নেবে পুলিস।'

সর্ববিজয় থমকে গেল।—'হ্যাঁ, সার্চ করলেই হলো আর কি!'

বললো বটে মুখে, কিন্তু বুঝলো তপনের কথা অকাট্য। স্নানাহার করবার ধৈর্যটা তাকে ধরতেই হবে।

॥ দশ ॥

পূজোর ছুটীর দুপুর। পড়তে পড়তে মধ্যাহ্নের আলস্যে তপনের চোখ বুজে এসেছে। হাতের বইটা শব্দ করে মাটিতে পড়তেই তন্দ্রা ছুটে গেল। ও-ঘরে বিলুর গলা। মহাভারত পড়ছে। শ্রোত্রী ঠাকুমা। অর্জুন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যভেদ করতে যাচ্ছেন—

"হয়গ্রীব, বন্ধুজীব অধরের
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা
বুকপাটা, দন্তছটা জিনিয়া।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথ

—'বুঝেছ ঠাকুমা!' অর্জুনের এমন চওড়া বুক আর ঝকঝকে দাঁত যে তাকে দেখে মেয়েদের আর ধৈর্য থাকে না। বিয়ে করবার জন্য একেবারে পাগল হয়ে ওঠে। অর্জুন কিন্তু হুবহু মেজদার মতো দেখতে। কিন্তু এটা তো মিলছে না, মেয়েরা তো কই মেজদাকে বিয়ে করবার জন্য হুড়োহুড়ি লাগায়নি!'

—'মেয়েরা না লাগাক, মেয়ের মায়েরা তো পাগল হয়েছে!'

ঠাকুমার হাসি শোনা গেল।

—'মেয়ের মা? রামো! বুড়ীদের সঙ্গে মেজদার বিয়ে দেবে নাকি?'

—'কার বিয়ের কথা হচ্ছে গো বিলুদাদু?'

মুখ্যি মহাভারত শুনে পুণ্যসঞ্চয় আর দুপুরের ঘুমটি দেবার উদ্দেশ্যে বোধহয় আঁচল বিছিয়ে শুলো মেঝেতে।

—'ভাগ্! যার বিয়ে হোক না, তোমার কি? তুমি বক্‌বক্ করবে তো আমি মহাভারত পড়বো না।' বিলু ধমকে উঠলো।

বিয়ে? তপনের? এখন বিয়ে কি? অবশ্য তার বন্ধুদের সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। ছাব্বিশ বছরে একটি তো বটেই, দুটি সন্তানের বাবাও তারা অনেকে। কী জঘন্য এই বিয়ে করা-টরা! একটা বারো-তেরো বছরের মেয়ে। নাকে নোলক, 'পতি পরম গুরু' মার্কা চিরুনি নিয়ে হয় ড্যাব-ড্যাব করে গরুর মতো তাকিয়ে থাকবে, নয়তো মুখ চোখ ঘুরিয়ে পাকামো করবে। বিদ্যে বড়জোর ইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণী।—এন্তার ভুল বানান আর 'প্রাণেশ্বর' 'প্রিয়তম' ছড়িয়ে চিঠি লিখবে।...শরতের নরম আলো-ভরা দুপুর। যৌবন-চিন্তা জাগলো তপনের মনে।

বেলস্ পার্কের ঝিল, সবুজ ঘাসে তার পাড় বোনা। ঝাউগাছে হেলান দিয়ে পাঠরতা তন্বী—মধুকর যার পিবতি রতিসর্বস্বম-ধরম্...চমকে উঠলো তপন। কি ভাবছে? কি ভাবছে সে যা-তা! কিন্তু ভোলা যায়না যে। সেই বেপথুমতীর মূর্ছাতুর স্পর্শ এখনো লেগে রয়েছে তপনের বুকের ডানপাশটাতে। কত উপনিষদের ব্যাখ্যা শোনা হলো,—মায়ার বুজরুকি ওড়াবার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। ডিউটি দেওয়া রোগীর ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একটু নিজেকে ছুটী দেয়নি তপন। মুহূর্ত কাটায়নি অলস-আলসে। তবু কেন মুছলো না সে-স্পর্শের স্মৃতি? শত কর্তব্যের চাপ, ধর্ম আর নীতির চোখ-রাঙানি—সব সরিয়ে কেন বার বার মনের পাতে ফুটে ওঠে নীল কমলের মতো চোখ দুটি।

রুথ। রুথ খ্রীষ্টান, কনক ধাইয়ের মেয়ে। তার জন্মের ইতিহাসে সম্মানের স্বীকৃতি নেই। কত রূপ আর কত গুণ তার —তবু সম্ভ্রান্ত কোনো খ্রীষ্টান যুবক এগিয়ে আসছে না তাকে আংটি পরাতে। রুথ সুন্দরী, গুণবতী। তার মন? সে-ও 'সহস্র বৎসরের সাধনার ধন'। বিনা সাধনায়, একটুও পাবার ইচ্ছা জাগবার আগেই, সে মন এসেছে তপনের কাছে। তপন

জানে, জেনেছে পাঁচ বছর আগে—যেদিন ষোলো বছরের মেয়ে অনুবাদ আর গ্রামার নৈবেদ্যর মতো সাজিয়ে নিবেদন করতো। তপন দেখেছিল কেমন করে রুথের গোলাপী মুখ লাল হয়ে উঠতো, বুজে আসতো চোখের পাতা। ভালো কি লাগেনি তপনের? ভালো লাগেনি? কোন্ একুশ বছরের ছেলের ভালো না লাগে? কিন্তু সে নিজেকে সংযত করেছিল। মাত্র সেদিন বাবা মারা গেছেন। পরীক্ষার ফল বেরুতেই মিশনের কাজ পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল তপন। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে পরিবারে ঝড় উঠেছিল তখন। সেই ঝড়ের মধ্যে তপন যদি আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলতো তবে মা কি করতেন? দাদার খবর নেই, বিলু মোটে পাঠশালা ছেড়েছে, তপন তাই ভাল-লাগাকে কঠিন হাতে ঠেলে দিয়ে, প্রথম সুযোগেই পালিয়েছিল রুথের কাছ হতে। স্কুলে, রামকৃষ্ণ মিশনে, সেবা-সমিতির কাজে নিজেকে এমন করে সঁপে দিয়েছিল যে, নিজের কথা ভাববার একটুও সময় পেতো না। ভেবেছিলো—সে ভুলে গেছে সব। গতবছর রুথকে পড়াবার কথায় তাই আপত্তি করেনি। পড়াতে ভালো লাগে। রুথ বুদ্ধিমতী। এমন ছাত্রী কাম্য। আগের ছেলেমান্‌ষী? হাসি পেয়েছিল তপনের। কবে চুকে গেছে সব। কোন্‌দিন দেখা যাবে ঐ জো ব্রাউনেরই 'পিউ'তে বসে আছে রুথ ব্রাউন।

পড়াতে গিয়ে চমকালো তপন। সেই ঝুরো চুল উড়ে পড়ছে কপালে। শান্ত চোখের পাতা নামানো। তেমনি অনুরাগ-রক্তিম মধুর মুখ। তপন তাকালো নিজের দিকে। ভোলেনি—সেও ভোলেনি রুথকে। মনের কোন্ গহীনে লুকিয়ে ছিল রুথ, দাঁড়িয়েছে সামনে এসে। আর যেন থরকম্পিত লাজুক মেয়ের অনধিকার প্রবেশ নয়.—তার জোর বেড়েছে।

তপন ফিরতে চাইল। ভাবলো—যা কখনো, কোনোদিন সার্থক হবে না, তার পরমায়ু বাড়াবে না সান্নিধ্যের সিঞ্চনে। দাদার

চিঠি এসেছে, টাকা পাঠাচ্ছে। দাদা এলেই ছেড়ে দেবে মিশনের মাস্টারি। থাকবেই না এখানে।

কলকাতা……ইউনিভারসিটি……এম.এ. ক্লাস…ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। তপন কলকাতা চলে যাবে। যে ক'দিন দাদার আসতে দেরী। তারপর আর কিছু নয়—কেবল সুন্দর বইয়ের রাজ্য। গোলদীঘি,—তার পাড়ে বসে টাট্‌কা খবর পড়া,—কাগজে তখনো প্রেসের গন্ধ লেগে। রাস্তায় হ্যাণ্ডবিল পড়েছে—ষ্টারে—'দুর্গেশনন্দিনী'—ঘোড়া নিয়ে জগৎ সিংহের মঞ্চে প্রবেশ।

॥ এগারো ॥

পুলিস-লাইনের মাঠে বার্ষিক স্পোর্টস আরম্ভ হয়েছে। সহর ভেঙে পড়েছে সেখানে। সিনেমা, থিয়েটার—ক্বচিৎ দেখা দেয়। মাস ছয়েক আগে কলকাতা হতে একটা ছবি এসেছিল—'জয়দেব'। মেমসাহেব পেসেন্স কুপার তাতে জয়দেবের বউ পদ্মাবতী সেজেছিল। শাড়ি, ঘোমটা আর ঠাণ্ডা পা ফেলে ঠিক যেন দত্তবাড়ীর মেজবউমা!

ষ্টীমার-অফিসের মস্তবড় হলঘরে একপাশে ষ্টেজ বেঁধে ছবি দেখানো হ'ত। দু'ধারি আসন। মোটা চিক দিয়ে মেয়েদের আবরু রক্ষার ব্যবস্থা। সামনে সতরঞ্চি—টিকিটের দাম দু'আনা। তারপর বেঞ্চ আর চেয়ার—চার আনা, ছ'আনা। যত দূর, দাম তত বেশী টিকেটের। তাজ্জব কাণ্ড! ছবি, কিন্তু দিব্যি জ্যান্ত মানুষ। হাঁটছে, চলছে, হাসছে, কাঁদছে, ঠোঁটও নড়ছে—কেবল কথার শব্দটুকুই শোনা যায় না। হেন ছেলে কোনো ঘরে নেই, যে সেই তামাসা না দেখেছে। তবে মেয়েরা গেছে কমই। গিন্নীরা গেলেও, মেয়ে-বউ প্রায় কেউই যেতে পায়নি। কে জানে কার মনে কি আছে। হয়তো বা হুড়মুড় করে এসে ঢুকবে মেয়েদের জায়গায়,—তখন?

তা আমোদ আর কই সহরে? এক বিয়ে পৈতে—তাতে আবার লৌকিকতার হাঙ্গামা। মেয়েরা যা আনন্দ করে এই পুলিস-লাইনের স্পোর্টস্ আর কালীপূজোর সময়। কালীপূজোয় কী আমোদ! তিনদিন ধরে যাত্রা, কবিগান, তরজা, তারপর বাজী পোড়ানো। সেকি বাজী! তেমন বাজী পৃথিবীর কোথাও

কখনো কেউ দেখবে না। হুস করে হাউই কোন্ স্বর্গে উঠে যায়, ঝর্-ঝর্ করে বড় বড় আগুনের ফুল ঝরায় তুবড়ী। আর কী ভীষণ কুমীর-বাজী, বোমা! মেয়েরা তিন-রাত্রি-ধরে আকণ্ঠ-ভরে যাত্রা দেখে। বাড়ী ফিরে গল্প করে নট্ট কোম্পানীর সুন্দর সখীর দলের। কী তেজ সেনাপতির! সামনের বারও ওরা এলেই ভালো হয়। কবিগান আর তরজার আসরে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ, আজেবাজে বকে কিনা কাবিওয়ালারা। পুলিস-লাইনে মেয়েদের আসা নিয়ে কোনো ভয়ের কারণ নেই। গুণ্ডারা কিছু করতে সাহস পাবে নাকি এখানে! পুলিস-সাহেব আছেন না?

একটার পর একটা খেলা হয়ে যাচ্ছে। জিলা-স্কুলের ছেলেরাও এ স্পোর্টসে পুলিসদের সঙ্গে যোগ দেয়। বিলু জিলা-স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ে, সেও খেলছে।

বর্ষা-ছোঁড়ায় তার নাম ছিল। প্রথম হয়েছে একটি পুলিস, দ্বিতীয় আনন্দবাবুর ছেলে সুকেশ, বিলু তৃতীয়। তা তৃতীয় হলেও প্রাইজ পাওয়া যায়। চিকের আড়ালে বসে মায়ের মনটা একটু খারাপ হলো। গজগজ করলো মুখ্যি—'সব বিশ-বাইশ বছরের দস্যিগুলোর সঙ্গে কি পারবে বিলু, চোদ্দ বছরের ছিপছিপে ছেলে!'

—'এই মুখ্যি! চুপ কর্।' মোক্ষদাকে শাসন করলো শাস্তি।

বিলুর আর একটা খেলা আছে। অবস্টাক্‌ল রেস। অবস্টাক্‌ল রেস বড় শক্ত খেলা। নানা প্রতিবন্ধক টপ্‌কে ছুটতে হবে। দূরে দেখা যাচ্ছে উঁচুতে বাঁধা কালো বোর্ড। তার গায়ে ঝুলছে পিনে আটকানো সোনার পদক। এ পদক দেন প্রতিবছর জমিদার স্বরাজ রায়। বোর্ডের সামনে পাতলা বাঁশের সিঁড়ি, সেই পাতলা চেরা-বাঁশকে আবার সাবান-গোলা মাখিয়ে পিছল করে রাখা হয়েছে, তাই বেয়ে উঠে, তবে পদক আনতে হবে। সবচেয়ে শক্ত খেলা—সবচেয়ে ভালো প্রাইজ।

ওদিকে বাঁ পাশ দিয়ে দৌড়ে আসছে বিলু। কোঁকড়া চুল উড়ছে, পা মাটিতে ছোঁয় কি না-ছোঁয়। শান্তি, মুখ্যি, মা সবাই দেখলেন, আর মায়ের পাশে বসে দেখলো রুথ। বিলু সবার আগে।

বিলু পৌঁছেচে। শেষ বাধা পার হলো। বেয়ে উঠছে বাঁশের সিড়ি,—হাত বাড়ালো পদক ছিঁড়বার জন্য। বিপদ ঘটলো! বিলুর প্রায় সঙ্গেই ছিল শ্যামসিং জমাদার, সেও হুমড়ি খেয়ে পড়লো, হাত বাড়ালো। মস্তবড় ভারী ছেলে শ্যামসিং, পাতলা চেরা-বাঁশের সিঁড়ি ঝোঁক সামলাতে পারলো না—মচ্ করে শব্দ হলো, ভেঙে গেল। পাশের খুঁটি ধরে, এক পাক ঘুরে শ্যামসিং পরের থাকে পা রাখলো, কিন্তু বিলু পাখীর মতো উড়ে পিছনদিকে দশহাত নীচে ছিটকে পড়ে গেল।

চিকের মধ্য হতে মেয়েরা চীৎকার করে উঠলো। মা মুহূর্তে বাইরে এসে দাঁড়ালেন, রুথ সামনে ছুটে গেল। ঝুলন সিং ছোট্ট শিশুর মতো বিলুকে পাঁজা-কোলে করে ক্যাম্পে ঢুকলো। বিলু অজ্ঞান—হাতের মুঠোয় কিন্তু পদক রয়েছে।

—'কে পড়েছে? কে চোট খেয়েছে? শিবেশবাবুর ছেলে বিলু? তপনের ছোট ভাই? জিলা-স্কুলের ছাত্র জ্যোতি?'

—'এখন কেমন? জ্ঞান হয়েছে কি? হাড় ভেঙেছে?'

উদ্বিগ্ন মুখগুলির দিকে চেয়ে আর প্রশ্নের জবাব দিয়ে-দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লো ভলান্টিয়ারের দল।

সন্ধ্যার পর বিলুর জ্ঞান ফিরে এলো। কপাল ফেটে রক্ত ঝরেছে অনেক, আর পায়ে চোট। প্রথম সব ঝাপসা। দুপুর-বেলা ঘুমিয়ে উঠে যেমন ঠাহর হয়না সময়টা সকাল না সন্ধ্যা, তেমনি বিলুও কিছু বুঝছিল না—সে কোথায়, কি হয়েছে তার, সময় কত।

—'হাঁ কর তো, বিলু'—কে বললো। আর কিছু না ভেবেই

হাঁ করতে বিলুর মুখে পড়লো গরম দুধ। বিলুর চোখ পরিষ্কার হয়ে এলো। চেয়ারে বসে মা, মেজদা। মুখের উপর ঝুঁকে তাকে দুধ খাওয়াচ্ছে রুথ—রুথদি। এখানে কোথায়? শুয়ে কেন সে? মনে পড়লো—অবস্টাক্‌ল রেস···

—'আমার মেডেল?' বিছানায় হাত বাড়ালো বিলু।

— 'নড়িস না।'—তকলিফ্‌ মৎ কর্‌না, দোস্ত!'—বলে উঠলো সবাই।

ডান-পা কাঠের বন্ধনে আট্‌কা, রক্তক্ষয়ে শরীর যারপরনাই দুর্বল। চিত্ত ডাক্তার বলেছেন—একেবারে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। নট্‌-নড়ন-চড়ন। বাৎসরিক পরীক্ষা বন্ধ।

সিভিল-সার্জন ডেন্‌মোর সাহেব একদিন এসে পায়ের বন্ধন-মুক্তি দিলেন। লিখে দিলেন কড়া মালিশের ওষুধ। পরীক্ষা দিতে পারবে না শুনে ধমকে উঠলেন—'নন্‌সেন্স! গিভ হিম চিকেন-ব্রথ্‌, উইদিন এ মান্থ হি উইল বি অল্‌রাইট।' মা তাকালেন ঠাকুমার দিকে।

সুরসুন্দরী আশি বছরেও শক্ত-পোক্ত মানুষ। সম্প্রতি বিলুর দুর্ঘটনায় বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন। ছেলে যাবার পর হতেই সংসারে যা কিছু বিপদ আপদ অশান্তি হয়,—মনে মনে জানেন তিনিই দায়ী তার জন্য। ডাক্তার সাহেবের ব্যবস্থা শুনে ঝট্‌ করে উঠে পড়েছেন। রুথ বিলুকে 'আটলাণ্টাস রেস' পড়ে শোনাচ্ছিল—এক ঝামটা দিলেন তাকে।

—'হ্যাঁ লা রুথ, আমরা না-হয় বামুনের বিধবা, জাত যাবার ভয়। তুই খিস্টান-মিস্টান মানুষ, ওসব তো তোদের খাদ্যই—তুই বুঝি পারিস না 'রুথ' রেঁধে দিতে বিলুকে?'

ছলছল চোখে তাকালো রুথ। পারে, খুবই পারে সে।

কবে হতেই তো মুরগীর স্টু-র কথা ভাবছিল,—ভয় পায় যে বলতে।

একমাস দূরের কথা, পনেরো দিনের মধ্যেই বিলুর লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিল। মা কিন্তু ভয় পেলেন। রুথ মুরগী রেঁধে বামুন-বাড়ী আনছে, জানাজানি হলে ভয়ানক গণ্ডগোল হবে।

'কেউ জানলে তো?' ঠোঁট ওল্টালেন ঠাকুমা।

'বড় ভালো,—সোনার মেয়ে রুথ। কে জানে কার শাপে কন্‌কির পেটে জন্মেছে, ভালো হবে, পরের জন্মে খুব ভালো হবে ওর...'

বিলু যেদিন প্রথম স্কুলে গেল, তার মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবার পর উপরোক্ত সত্য ঘোষণা করলেন ঠাকুমা।

মুখ্যিও সায় দিল—'খুব ভালো মেয়ে। চিনামাটির ভাণ্ডে কী ওষুধ রুথ দিদি আনতো গো ঠাকুমা, যা খেয়ে বিলু ঝট্ করে সেরে উঠলো?

—'পোড়া কপাল! রুথের ছোঁয়া দ্রব্য খাবে বিলু?' চোখ কপালে তুললেন সুরসুন্দরী। 'ও তো মালিশের ওষুধ। ফাদার ব্যাটা দিত। খিষ্টানের ছোঁয়া অমর্ত হলেও কি আমাদের খাবার জো আছে? হ্যাঁরে তপু? রুথ আসছেনা কেন ক'দিন ধ'রে?' তপনের দিকে ফিরলেন ঠাকুমা।

—'রুথের পরীক্ষা।'

তপন পা বাড়ালো বাইরের দিকে। আজ হতে বি. এ. পরীক্ষা আরম্ভ হলো। মাদার নিজে রুথকে পৌঁছে দেবেন পরীক্ষা-কেন্দ্রে। দুপুরবেলা সাইকেল নিয়ে তপনও একবার ঘুরে আসবে.—কত দূর আর! মাইল পাঁচেকও হবে না।

॥ বার ॥

বেলস্ পার্কের ওপাশ দিয়ে সিমন্ সাহেবের বাড়ীর মোড় ঘুরতেই রুথকে দেখা গেল। লাল-টুকটুকে মেয়ে-ছাতা মাথায় চলেছে। একটু জোর পায়ে হেঁটে তপন তার সামনে যেতেই চমকে রুথ মাথা তুললো।

'খবর পেয়ে গেছো?' তপন হাসলো।

'হ্যাঁ, এইমাত্র মাদার দেখালেন—টেলিগ্রাম এসেছে।' রুথও হাসলো! হেঁট হলো, বুঝি প্রণাম করবে। তপন আটকে দিলো। পুরুষের কঠিন মুঠিতে গলে গেল মোমের মতো হাত। চোখ তুলে চাইলো রুথ। চোখে চোখ পড়লো। তপন বুঝলো, রুথ বুঝলো। সেই ঝাঁ-ঝাঁ-করা দুপুরে আর কেউ দেখলো না, বুঝলো না। কেবল ঝাউগাছগুলি মাথা দুলিয়ে দিলো, কেবল সামনে ঝিলের জল ছোট ছোট ঢেউ তুললো। কেবল ঝরে পড়লো গুটি দুই অশোকফুল। রুথ দরজা খুলে ফেলেছে। তপন সাড়া দিয়েছে—ভালবেসেছে। পুরুষের মতো ভালবেসেছে —কেবল ভাব দিয়ে নয়, বীর্য দিয়েও। রুথকে রক্ষা করেছে অত্যাচার হতে, হাত ধরে নিয়ে গেছে জ্ঞানের রাজ্যে। তবু ছিল একটু আগল। বিলুর দুর্ঘটনা ভেঙে ফেললো তাও। বড় কাছাকাছি, পাশাপাশি হলো দুজনে। তপন তখনো কিন্তু মনকে বোঝাতো—সব ঠিক আছে। ঠিক ছিল না, ভেজানো দরজা রুথের ছোট্ট আঙুলের ছোঁয়ায় একেবারে খুলে গেল। একটুও আড়াল আর রইলো না। তপন মুখ নীচু করলো—ঊর্ধ্ব-বিকশিত ফুলের মতো রুথের মুখ ধরা দিলো সীমানার মধ্যে। প্রথম ছোঁয়ায় কেঁপে উঠলো কুমারী-তনু।

স্কুলের দিকে ফিরে যেতে যেতে তপন ভাবছিল এরি জন্য সে কি রুথের পরীক্ষার খবর পেয়ে এমন রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিল ? কিন্তু কি হলো ? তারা কেউ কোনো কথা বললো না কেন ? তবে কি মনে-মনেই সব কথা বলা, সব বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে ? বোঝাপড়া !! তপন চমকে উঠলো। কি করলো তপন ! কি ভাবছে তপন ! যা ভাবছে তা ঘটলে কোথায় যাবে ঠাকুমা, বিলু ? আর মা ! মাগো ! নোন্‌তা জল তপনের ভেতর হতে ঠেলে উঠতে লাগলো। তপন জানে, মা একটি কথাও বলবেন না। সমাজ, স্বজন যখন শতমুখে তাঁর তপুর নিন্দা করবে তখন তিনি প্রাণপণে লড়ে যাবেন। বলবেন—তপুর কাজে তাঁরও মত ছিল, আছে সমর্থন। তারপর ? তারপর যে ছেলে ধর্ম ছেড়েছে তার একটি পয়সাও ছোঁবেন না। দাদা আসবে ? আসবে না সে। একদিনের দুর্দান্ত বিপ্লবী ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রের উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবনকে এমন এলো-মেলো করে ফেলেছে যে মায়ের সামনে আসতে সাহসই হবেনা তার,—তপন সে-কথা ভালোই জানে, জানেন মাও, কিন্তু বুঝতে চান না। দাদা আসবে না। তপন যাচ্ছে চার্চে, হয়তো রেভারেণ্ড চৌধুরী হয়েছে তার নাম। বুড়ী ঠাকুমা বিছানায়। স্বজন ছেড়েছে সম্পর্ক, পাড়াপড়শী ফিরিয়েছে মুখ। আর বিলু ? চকচকে চোখে যার প্রতিভার আলো, কত সাহস ! বিলু ঢুকেছে ডকে। সন্ধ্যা সাতটায় ওভারটাইম করে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ী ফিরছে। উৎকট ভয়ে তপনের মুখ দিয়ে অস্ফুট চীৎকার বেরিয়ে এলো।

‘কি হয়েছে তপনবাবু ? অ্যাঁ, ঘামে যে জাবড়ে গেছেন একেবারে !’

তপন স্কুলের সামনে এসে গেছে। রমেশ মাস্টার আবার জিজ্ঞেস করলো—‘কোথায় গিয়েছিলেন ?’

তপন চারদিকে তাকালো। দশ মিনিটে সে দশ বছরের চিন্তা

করেছে। কথা না বলে গেট ঠেলে ঢুকলো স্কুলের কম্পাউণ্ডে। বড় ঘড়িতে চারটার ঘণ্টা বাজছে ; এক্ষুণি ছুটি হবে।

ওঃ, ভারী বিদ্বান! মানুষ দেখেনা চোখে, কথার উত্তরই দেয়না। অমন ঢের পণ্ডিত দেখেছে রমেশ মাস্টার ঢাকা নর্মাল স্কুলে পড়বার সময়, আর নিজেও সে কম নাকি? ইংরেজী সব বোঝে। লেখাটা অভ্যাস নেই—তাই, নয়তো দেখা যেত! গিয়েছিল তো তপন চৌধুরী রুথকে পাসের খবর দিয়ে খুশী করতে। বিষাক্ত হাসি খেললো রমেশের ঠোঁটে। যাক্‌না কিছুদিন। দেবে ফাদারকে সব বলে। দেখবে তখন রুথের কী অবস্থা হয়। ফাদার এমনি খুব ভালো, মহাদেব। হায় হায়! হিঁদুর দেবতার নাম মুখে এলো! সাহেব মহাদেব নন, মহাদেব নন। সেণ্ট পিটারের মতো। কিন্তু এসব ব্যাপারে বড় কড়া। রুথকে একেবারে ঝুল করে দেবে না! ছেমড়ীর ঠমক কত! কোনো দিকে চাইবে না, হাসবে না। কনুই-ঢাকা জামা প'রে এমন ভাবে চলবে, যেন অপাপবিদ্ধা মহাকুমারী মেরী-মা। আরে তুই কী, তা কি অজানা কারোর? নেহাত ফাদারের ভয়ে সবাই চুপ করে থাকে। জেনানা-মিশনের মাস্টারনী আছিস,—থাক্। কেউ বাধা দিচ্ছে না, কিন্তু এসব কি? হিঁদুর সঙ্গে প্রেম? ফাদার জানলে তোর ঐ প্রেমিকের পৈতে ছিঁড়ে চার্চের মাটি চাটাবে তা জানিস?

রমেশ ফুঁসতে লাগলো। এখন নয়। এখনো সময় আসেনি। রমেশের বড় ছেলেটার এবার ক্লাস টেন। ইংরেজীতে একদম গাধা। তপ্‌না তাকে পড়ায়। না না, পয়সা নেয় না। হ্যাঁ, এদিকে বাম্‌নার একটা গুণ আছে। পড়ায় ভালো,—আর পয়সাও নেয়না। বিনয় মাস্টারকে রাখলে নির্ঘাৎ লাগতো দশ টাকা মাসে। জান নিক্‌লে যেতো রমেশের। বউটাও আবার মুশকিলে ফেলেছে। কনক ছাড়া উপায় কি? এ-দুটো বিপদ রমেশের ভালোয় ভালোয় কেটে যাক,—তারপর দেখাবে সে কত ধানে কত চাল!

॥ তের ॥

কী যেন হয়েছে তপনের। বাইরে সব ঠিক—তেমনি গল্প বলা, মুখ্যির পেছনে লাগা, টমকে নিয়ে খেলা আর আচমকা বিলুকে তুলে ধরে একপাক ঘুরিয়ে দেওয়া—সব ঠিক। কিন্তু কেমন যেন ক্লান্তির ছায়া তপনের কপালে। একটু যেন কালি পড়েছে টানা-চোখের কোলে। রাতে উঠে বসে থাকে পোর্টিকোতে চেয়ার টেনে। মাকে জড়িয়ে পিঠে মুখ গুঁজে তেমনি শোয় আগের মতো, কিন্তু হঠাৎ ছট্‌ফট করে উঠে চলে যায়।

ধরা পড়লো ভাবান্তর মায়ের চোখে।

—'তপু! তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস।'

'রোগা?' বাইসেপ ফোলালো তপন।

—'হ্যাঁ রোগাই তো। আর এত ভাবিস কি? তোর উপর ক'বছর ধরে বড় ধকল যাচ্ছে। মনা এলে বিশ্রাম পাস একটু।'

মা বিমনা হলেন। কবে আসবে মনা? কতদিন তো কাটলো প্রথম চিঠি আসার পর। অবশ্য মাসের পাঁচ তারিখ পেরোয় না, তার মনি-অর্ডার আসে। তাতে কিছুটা সুসার হচ্ছে বইকি সংসারের। দলনীর ছোট ছেলেটা ইনফ্যাণ্টাইল-লিভারে ভুগছিল, মা এনে চিকিৎসা করালেন, জমি-জায়গাগুলোর থিতভিত আর বোনঝি শান্তির বিষিয়ে-যাওয়া পলিপাসের চিকিৎসা তো মনার টাকাতেই চলছে। কিন্তু সে নিজে আসছেনা কেন? যুদ্ধে গিয়েছিল সে, মেডেল পেয়েছে সাহসের জন্য। এখানে এলেই ভালো চাকরী পাবে—সবাই বলেছে। অতদূর মেসোপটেমিয়ায় থাকবার দরকারটা কি?

বাইরে ভাঙা গলায় কে চেঁচালো—'তপনবাবু!'

তপন বেরুলো ঘর হতে। মা কৌতূহলী চোখ পাঠালেন বাইরে। কে এলো এমন জল-ঝড়ে—রাত ন'টার সময়? রমেশ মাস্টার। মাথায় হোগলার টোকা। ভালুকের মতো হাঁপাচ্ছে।

হাউমাউ করে রমেশ যা বললো তার মর্ম ঃ

মিসেস শীলের এই নাইন্থ কনফাইনমেণ্ট। শরীর খুব খারাপ। কনককে অনেক আগে হতেই রমেশ ঠিক করে রেখেছিল, কিন্তু সেই বুড়ী-ডাইনী স্বরাজ রায়ের মেয়ের কেস নিয়ে কলসকাঠি চলে গেছে। মুনিয়া চামারনী এসেছে, কিন্তু মিসেস শীলের সেই যে দাঁত লেগে গেছে আর খুলছে না। মুনিয়া ভয় পাচ্ছে, বলছে পারবে না। ডাক্তার চাই। ডাক্তার নেবে পঞ্চাশ টাকা। কোথায় পাবে রমেশ?

মা মুহূর্তের মধ্যে ঘর হতে বেরিয়ে এলেন গারে চাদর জড়িয়ে। তপন জানে, সবাই জানে--মেয়েদের এই বিপদে জাতি, ধর্ম, সমাজ, কিছুই মানেন না মা। তপন কিছু বললো না, শুধু টেবিলে শোয়ানো বড় টর্চটা হাতে নিলো, আর ছাতায় ঢেকে দিল মায়ের মাথা।

ঠাকুমা ঘরের মধ্য থেকে গনগন করে উঠলেন—'চললো নরক ঘাঁটতে!'

রুথ হাঁড়ি হাঁড়ি গরম জল যোগান দিচ্ছে। রমেশ শীলের মা শাপান্ত করছে কনককে। ছেলে-মেয়েদের কান্না আর রমেশের চীৎকারে বাড়ী গরম।

বিপদ কেটে গেল ভোর ছ'টার সময় বহু কষ্টে। মায়ের চুল ঘামে ভিজে চপচপে, মুখেও শ্রান্তির ছায়া।

—'তুমি এখন থাকবে নাকি রুথ?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

—'আমি? না। আমিও যাবো আপনার সঙ্গে। রোদ উঠে গেছে, এক্ষুণি রেভারেণ্ড জানা আসবেন শিশুকে 'ব্যাপটাইজ' করতে।'

—'তুমি থাকনা, রুথ! বাচ্চাটার গড-মাদার হবে।' গদগদ হলো রমেশ।

—'না, আমার কাজ আছে।' পা বাড়ালো রুথ।

তপন চাইলো রুথের দিকে। রাত-জাগার ক্লান্তি তার মুখকে মধুর বিবর্ণ করে দিয়েছে। চোখ দিয়ে রুথকে স্নেহস্পর্শ দিলো তপন। রুথ মাথা নীচু করে ছিলো—সে দেখলো না, আর তপন বুঝলো না যে তাদের লক্ষ্য করলো তুজন। মনটায় এতক্ষণ উদারতার হাওয়া বইছিল, মুহূর্তে বিষিয়ে গেল। মনে মনে একটা বিশ্রী গাল দিল রমেশ। ছেলেটার পরীক্ষা শেষ হোক, তারপর দেখাব মজা।...আর বুঝলেন, দেখলেন মা।

যে চোখে 'উনি'—তপনের বাবা তাকাতেন হৈমবতীর দিকে, অবিকল সেই দৃষ্টি ছেলের চোখে। আকাশটা যেন খান্‌খান হয়ে ভেঙে পড়লো মায়ের মাথায়। মা কি অন্ধ? মা কি মূঢ়? কেন বোঝেননি এতদিন? তপন রোগা হয়ে যাচ্ছে, মা ভেবেছেন সংসারের ক্লান্তি। তপন যে যুদ্ধ করছে। তাঁর সোনার তপন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সহরের কোন্ মা তপনের মাকে ভাগ্যবতী না বলে! এমন ছেলে কি কারও আছে!

দোলপূর্ণিমার রাতে ঘর আলো করে জন্মেছিল তপন। তখনি কী চুল ছেলের মাথায়! সবাই ঝাঁকে ঝাঁকে উলু দিয়ে, সন্দেশ খেয়ে বাড়ী ফিরেছিল। বলেছিল—'শিবেশ ডাক্তারের ভাগ্যই আলাদা। ছেলের পর ছেলে। সোনার মতো রং। বড় ছেলে কালো, এ হবে গোরা।' তারপর তপু বড় হলো, বৃত্তি পেলো। মনা পালালো। তিনি গেলেন। সব ঝড় কুড়ি বছরের ছেলের মাথায়। কিছু বুঝতে দেয়নি। সব সাবেক ঠাট্ বজায় আছে। তেমনি পূজোয় বিলোবার গাঁট-ভরা কাপড় আসে, লক্ষ্মীপূজোয় বাড়ী জমজম করে। তপন এত শক্ত, এমন হাসিমুখ আর সহজ

যে, মা কখনো কল্পনাও করেন নি তার জন্য চিন্তার কারণ ঘটতে পারে। মনার চিন্তায় মা পাগল হতেন,' তপন যে তাঁর শালকোঁড়া।

চাদর মুড়ি দিয়ে মা শুয়ে ছিলেন। ভাতের পাথরের কাছে বসেছেন কি বসেন নি। তপন বোঝে নি কিছু। বেগুনভাজা আর ডালভাত খেয়ে সে চলে গেছে জিলাস্কুলে। আজ বিলুর পরীক্ষা আরম্ভ। সকাল ন'টায় কপালে দই-এর ফোঁটা প'রে বিলু পরীক্ষা দিতে গেছে। মা ফিরেও তাকান নি। যা কররার করেছেন ঠাকুমা, আর বক্‌বক করেছেন সারাক্ষণ—'আগেই জানতাম শরীলে এত ধকল সইবে না। রয়স যেন বাড়ে নি, বুড়ো যেন হয় নি। রাতভরে হয়রানি করে এসে এখন ছেলেটার পানে চাইছে না।'

সত্যি চাননি মা। বিলু যখন পায়ের ধুলো নিয়েছে তখনো অবশ হয়ে ভেবেছেন তপনের কথা।

—'ওমা, ওঠো—'মুখ্যি ডাকলো। 'বিলু এসেছে। সন্ধ্যে লেগেছে।'

—'বিলু এসেছে? কই? কোথায়?'

মুখের কাপড় সরালেন মা। উঠে বসলেন। সত্যি নেমেছে অন্ধকার।

—'বিলু পড়ার ঘরে। রুথদি পরীক্ষার কথা শুধুচ্ছে। খাওয়া? আ কপাল! খাবে কখন? সে তো এসেই বসেছে গপ্পে। মুখ্যির কথা শোনে কি? দাসী-বাঁদীর কথা গেরাজ্যি করে কে? শুনছো না ঠাকুমা রাগছেন?'

মা ঢুকলেন পড়ার ঘরে।

—'বিলু ওঠ্, যা, খেয়ে আয়, ঠাকুমা ডাকছেন। কেমন হলো পরীক্ষা?' ছেলের মাথায় হাত রাখলেন মা।

—'হ্যাঁ বিলু, এখন ওঠ, খেয়ে একটু বিশ্রাম করবে, তারপর পড়া।' · হাসলো রুথ।

বিলু বেরিয়ে গেল ঘর হতে। মা বসলেন। আগে বসতেন ছোঁয়া বাঁচিয়ে, আজ বসলেন একেবারে রুথের পাশে। রুথকে ভালবেসেছে ছেলে, স্নেহে ভরে গেল মায়ের মন। কে-না ভাল-বাসবে রুথকে! খ্রীষ্টান? জন্মে কলঙ্ক? থাক্। রুথকে কোনো পাপ স্পর্শ করে নি। মা ভুলে গেলেন আজ সারাদিন ধরে সর্বনাশের ভয়ে তাঁর বুক ধড়ফড় করেছে, ভুললেন রুথের প্রতি কত বিদ্বেষ জমেছিল মনে। রুথকে ভালবাসলেন। তার কপালের চুল গুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'এবার এম.এ. পড়বে বুঝি?'

রুথ অবাক হলো। সঙ্কুচিত হলো। সে ভালো করেই জানে, তাকে স্পর্শ করলে মা স্নান করেন। সে কেবল পড়ার ঘরে ঢোকে। শোবার ঘরে ঢুকতো বটে বিলুর অসুখের সময়, কিন্তু বিলুর মালী নেম্‌মা তাকে বলেছে—সেই ঘর রোজ গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়া হতো।. আজ এই সন্ধ্যার সময়, মা রুথকে প্রায় কোলের কাছে টেনে এনেছেন! কেন? কেন এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটলো? রুথ তাকালো মায়ের দিকে, মা তার দিকেই চেয়ে ছিলেন। কী দেখলো মায়ের চোখে রুথ? রুথ চোখ নামালো, চোখ বুজলো।

মুহূর্তে রুথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মা। রুথ নিজেকে সামলাবার আগেই তারও মা হয়ে গেলেন তপনের মা। সেই সর্বংসহা মায়ের বুক ভিজিয়ে রুথের চোখের জল ঝরতে লাগলো। কেবল ভালবাসার দুঃখ নয়, জন্মসূত্রে গাঁথা যত লাঞ্ছনা, যত অপমান, মেয়ে-জীবনের যত বেদনা জমা হয়েছিল রুথের বুকে—সব তার চোখের জলে গলে পড়তে লাগলো।

॥ চৌদ্দ ॥

কনক বিছানায় গড়াচ্ছে। তার কি মাথা ধরেছে? জ্বর হয়েছে? জিজ্ঞেস করলো কুসুমের মা, জানতে চাইলো জোসেফ। কেউ উত্তর পেলো না।

কনকের সর্বনাশ হচ্ছে। দুপুরবেলা এসেছিল রমেশ পণ্ডিত। কী শাসান শাসিয়ে গেছে কনককে! বলবে। সে বলে দেবে ফাদারকে রুথ আর তপনের সব কীর্তি। প্রমাণ দাখিল করবে সব অন্যায়ের। কনক প্রথম অবিশ্বাসে ফুঁসেছে, তারপর বিনতিতে নত হয়েছে। পায়ে ধরেছে অবশেষে রমেশের।

—'কি তুমি জান, আমি জানিনা তার কিছু, কিন্তু ফাদারকে বোলো না কোনো কথা। তাড়িয়ো না রুথকে মিশন হতে।'

কেন তাড়াবে না? কেন বলবে না কোনো কথা রমেশ? কনক রেখেছিল তার কথা? থেকেছিল তার বিপদের সময়? তাহলে কি মুনিয়ার নখের বিষে—সেপ্‌টিক-ফিভারে মরতো তার বউ? রুথ শুনেছে তার কথা? বড় ঘেন্না রমেশের ছেলের গড-মাদার হতে! যে মাদারের আদরে এত তেজ, তিনিই জুতোর তলে থেঁতলাবেন সব জানলে। প্রমাণ নেই? কেন রুথ রোজ যায় তপনের বাড়ী? তপনের মা 'রুথের মা', আর বিলু রুথের 'বিলুভাই'? ঢং কত! চিঠি পাঠায়নি রুথ দপ্তরী মহান্তির হাত দিয়ে? তপন উত্তর দেয় নি? আছে, রমেশের কাছে চারখানা চিঠির প্রমাণ আছে। তপনের মা রুথকে দেয় কেন অত দামী ঢাকাই-শাড়ি?

ফাদার গেছেন দার্জিলিং, মাদার বিলেতে। ফিরুন তাঁরা

সেপ্টেম্বর মাসে, তখন এমন শাস্তি দেওয়াবে রুথকে রমেশ, যে ঘাঘরা ঝুলিয়ে ঐ ডি'সিলভার ঘরের আয়া হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না তার।

চোখ মুছে কনক জিজ্ঞেস করেছিল—কী চায় রমেশ—টাকা?

—'টাকা!! থু! থু!' থুতু ছিটালো রমেশ। বসলো এতক্ষণে চেয়ারে। —'টাকা দিয়ে কি পাপ কমে? তবে—?' এবারে যেন ঢোক গিললো রমেশ। তাকালো নিজের রোমশ, কর্কশ বাহুর দিকে, মুখে হাত বুলালো দু-একবার। তারপর হাঁকরে উঠলো —'বেশ। মুখ বন্ধ হবে, বদলে রুথ যাবে তার ঘরে।'

—'অ্যাঁ!'—আর্তনাদ করে উঠলো কনক।

—'কেন, দোষ কি? তপনের চেয়ে আমি কম কিসে? তপন মাস্টার, আমিও তাই। বয়স বেশী একটু? কিন্তু গায়ে এখনো অসুরের শক্তি। আগের বউয়ের ন'টা ছেলেমেয়ে আছে, রুথেরও আরো ন'টা হবে।'

—'দূর! দূর হও!'—চেঁচিয়ে উঠলো কনক, ছুঁড়ে মারলো সামনের চটিজুতোটা।

পশুর মতো গাঁক্-গাঁক্ করতে করতে ঘর হতে বেরিয়ে গেল রমেশ। কী ভয়ঙ্কর মূর্তি!

কে আছে কনকের? এ বিপদে কার কাছে যাবে? কে রক্ষা করবে রুথকে?

—'এমন অস্থির হয়েছ কেন? কেন করছো ছট্‌ফট? আমাকে খুলে বল তো সব। বলবে?' কপালে হাত পড়লো—ঠাণ্ডা, শান্ত হাত, শান্ত গলা।

বলবে? জোসেফকে সব বলবে কনক? ভাববার আর শক্তি কই? দু'হাতে স্বামীকে জড়িয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো কনক।

সব শুনলো জোসেফ। ভাবলো আর পায়চারি করলো। এসে দাঁড়ালো কনকের কাছে।

—'কনক! তপনবাবু কেমন মানুষ?'

—'ভালো। দেবদূতের মতো ভালো।'

—'রুথকে ভালবাসেন সত্যি?'

'রুথকে? ভালবাসে তপন? না না।'

ককিয়ে উঠলো কনক। মনে পড়লো টেবিল ছেড়ে চলে যাওয়া।

—'ওরা হিঁদু, ব্রাহ্মণ। কখনো রুথকে, খ্রীষ্টানকে ভালবাসতে পারে না—তবে করুণা করে। সব রমেশ পণ্ডিতের চক্রান্ত। ও ভয়ানক লোক, মিথ্যাকে সত্য, নয়কে হয় করতে ওর জুড়ি নেই।' আবার ভাবলো জোসেফ।

—'তুমি একবার সব কথা তপনবাবুকে বল। তিনি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান। রমেশ শীলকে ভয় পান না। একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন, দেবেন কোনো বুদ্ধি।'

ভয়ে কুঁচকে ছোট হয়ে গেল কনক। রুথকে চেনে না জোসেফ কিন্তু কনক ভালো করেই জানে, এ নিয়ে তপনকে কোনো কথা বলতে গেলে রুথ নদীতে ঝাঁপ দেবে।

কিন্তু উপায় কি? দিনে দিনে দিন কমলো। গতকাল এসেছেন মাদার, ফাদার আসবেন সামনের সপ্তাহে। তারপর কি হবে? রুথ কি কিছু জানে? বুঝেছে কিছু? কানে গেছে কোনো ফিস্‌ফিসানি? চোখে পড়েছে কোনো ইঙ্গিত? তেমনি শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ। ভাগ্যের পায়ে নিজেকে সঁপে নিশ্চিন্তে বসে আছে। চোখে জল কনকের।

দিনরাত বুক ধড়ফড়ানি। শত ডাকেও কাজে যায়না কনক। তার অসুখ। মাথা ঘোরে, দাঁড়াতে পারে না, হাত কাঁপে—পোয়াতি আর নিরাপদ নয় তার হাতে।

রমেশ শীল যতই মুখে তড়পাক, ফাদারের কাছে যাবার সাহস নেই তার, মাদার তো বহুদূরের কথা। আর তপনের গায়ে যে জোর! এক লাথিতে তাকে চাঁদমারীর পাহাড় পার করে দেবে। তার চেয়ে রেভারেণ্ড জানা ভালো। তাঁর কুৎকুতে চোখ আর ঠোঁট-বাঁকানো রমেশ যেন কিছুটা বুঝতে পারে।

রমেশ গেল জানার বাড়ী। জানা সাহেব তখন ডোরাকাটা পা-জামার উপর কামিজ ঝুলিয়ে কাগজ পড়ছে।

—'গুড মর্নিং, শীল। খবর কি ?'

—'মর্নিং, রেভারেণ্ড!'—বিনয়ে আনত হলো রমেশ।

—'বসো, বসো। তারপর ? বাচ্চাগুলোর একটা মা যোগাড় করে ফেলো এবার। তোমার মা বলছিল—বড় বিপদে পড়েছ বুড়ো বয়সে। স্যামুয়েলের বোনের সম্বন্ধে কি মনে কর তুমি ?'

স্যামুয়েলের বোন ? বুড়ী! জেনানা-মিশনের ঝি! মনে মনে জানার মুণ্ডপাত করলো রমেশ।

—'না, স্যার! এত তাড়াতাড়ি ওসব করলে মিসেস শীলের আত্মা হেভেন হতে দুঃখ পাবেন। একটা জবর খবর ছিল,—আমাদের সমাজের, ধর্মের বিষয়ে।'

—'ধর্মের, সমাজের বিষয়ে ?' নড়ে-চড়ে বসলো জানা সাহেব।—'ব্যাপার কি শীল ?'

বেঞ্চের উপর টান-টান হয়ে বসে, কখনো চোখ বিস্ফারিত, কখনো ছোট করে ব্যাপার বিবৃত করলো রমেশ। এমন কদর্য কাণ্ডের জন্য কঠোর শাস্তি না হলে সদাপ্রভুর নামে কলঙ্ক পড়বে—এবং পড়েছে এখনি—এই মন্তব্যে রমেশ উপসংহার করলো তার বক্তব্যের।

জানা মন দিয়ে সব শুনে, সামনের টেবিলের উপর পা তুলে, চোখ বুজে ফেলল। আশায়-আশায় কাটলো মিনিট দশেক,

একটু অধৈর্য হলো রমেশ। 'রেভারেণ্ড! ফাদারকে বললেই এই পাপের প্রতিবিধান হয়।'

জানা সাহেবের চোখ খুলে গেল—'তুমি পাগল হয়েছ' শীল? তপন সহরের সেরা ছেলে। কখনো তার নামে কেউ কিছু বলতে পারেনি। ফাদার তাকে ছেলের মতন ভালবাসেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বাংলা পড়ায় সে। আর রুথের মা যাই হোক, রুথ অতি ভালো মেয়ে! ডায়না দেবীর মুকুটের তুষারকণার মতো পবিত্র সে। তার পর—মনে মনে ভালবাসলে দোষ হয় না, তার জন্য কেউ শাস্তিও পায় না। তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবেন না, ক্ষেপে যাবেন বরং ফাদার।'

—'আজ্ঞে, তারা চিঠি চালাচালি করেছে।'

—'সে পড়াশুনার চিঠি। আমার এখানে বসেই মহান্তিকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে তপন, তাতে কেবল ভালো-ভালো কথা।'

জানা সোজা হয়ে বসলো—'বাজে কথা রাখ। তোমার মতলবটা কি বল তো?'

রমেশ নাক মুছলো, আমতা-আমতা করতে লাগলো।

হো-হো করে হেসে উঠলো জানা। —'ফাঁদে ফেলে রুথকে বিয়ে করতে চাও? এসব করলে তো আরো চটে যাবে রুথ। সোজা গিয়ে তাকে প্রপোজ করে ফেল। উঠি, আমার স্নানের সময় হলো। আজ আবার রূপাতলী যেতে হবে।'

জানা উঠে পড়লো। এক-পা দু'পা করে রমেশও বেরুলো বাড়ী হতে।

'শোনো—'। জানা ডাকলো মিসেস জানাকে—অ্যাগ্‌নেস জানা। ঢাকার মেয়ে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান; নরম, ঠাণ্ডা মেয়ে। সুন্দর বাংলা বলে। বানাতে জানে চিংড়ি মিশিয়ে লাউয়ের ঘণ্ট, পুলি-পিঠে।

—'কি?' অ্যাগ্‌নেস এগিয়ে এলো।

—'রমেশ শীল রুথকে বিয়ে করতে চায়।' হাসিতে ঝল্‌মল্‌

করে উঠলো কুৎকুতে চোখ। জানা দেখতে তো ভালোই। চোখ ছোট হলেই কি আর মানুষ কুৎসিত হয়?

অ্যাগ্‌নেস চমকে উঠলো—'ও গড! ছ্যাট্‌ বীস্ট্!'

'ছ্যাগো ডিয়ার! যেমন একটি বীস্ট্ জুটেছে তোমার কপালে!' স্ত্রীর বড় বড় চোখের পাতায় ঠোঁটের ছোঁয়া দিল হৃদয় জানা।

উকিল হৃষিকেশ জানার বড় ছেলে হৃদয় পড়তো ঢাকা মিটফোর্ডে। হাসপাতালের নার্স ছিল অ্যাগ্‌নেস। কি যে মতিভ্রম হলো, আর অ্যাগ্‌নেসও বাধা দেয় নি। বিয়ে করতেই হলো। তখন থার্ড ইয়ারে। বাবা টাকা বন্ধ করে দিলেন। সানি জন্মালো সেই অভাবের মধ্যে। স্বাস্থ্য ভেঙে গেলো অ্যাগ্‌নেসের। তবু সে বললো—'তুমি পড়, আমি চালিয়ে নেবো যে করে হোক।'

হৃদয় শুনলো না সে-কথা। ছেড়ে দিলো পড়া, চলে এলো এখানে কাজ পেয়ে। সহরতলীর চার্চগুলির ভার হৃদয় জানার উপর। সহরের মধ্যে মস্তবড় বাড়ী হৃষিকেশবাবুর। সেখানে থাকে তিন ভাই আর বাপ-মা! হৃদয় থাকে খ্রীষ্টান পাড়ায়।

সাজানো ঘর, চিকনের কাজ-করা পর্দা। অ্যাগ্‌নেস পিয়ানো বাজায় চার্চে। সুন্দর গান গায়। কেবল ইংরেজী নয়, বাংলাও—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে।"

—আহা, পাগল করা বাগেশ্রী! কান্তকবি রজনী সেনের গান।

সানি আর স্বপ্না—ছেলে-মেয়ে। তারাও সুন্দর মায়ের মতো। সব ভালো, তবু জ্বালা করে বুকের মধ্যে। মনে পড়ে বিজয়ায় মায়ের পায়ের ধূলো, ভাইফোঁটার মধু-ঘিয়ের গণ্ডূষ।

আঃ, কী বাজে ভাবনা! গায়ে জল ঢাললো জানা সাহেব। এক্ষুণি যেতে হবে রূপাতলী। কানাই বাগ আজ খ্রীষ্টান হবে।

আসবে অন্ধকার হতে আলোয়। পথভ্রষ্ট মেষশাবক ফিরবে দলে। এ জেলার অন্ত্যজদের মধ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশজন খ্রীষ্টান হতো আগে। প্রথম স্রোত থেমে এলেও এখনো খ্রীষ্টান হচ্ছে এরা। কেন হবে না? উচ্চবর্ণের হিন্দু তাদের ছুঁলে স্নান করে। বাস এদের প্রায় গ্রামের বাইরে। ডাক্তার যায় না এদের বাড়ী, মন্দিরে দেবতা নেয় না পূজো,—কেবল গালাগালি আর অপমান।

খ্রীষ্টান হলে ফাদার দো-নলা পেন্টুল পরতে দেয়, কামিজ দেয়, আবার লেখাপড়াও শেখায়, চাকরি যোগাড় করে দেয়। রোগে দুঃখে মস্ত বল ফাদার।

এই চাঁড়াল, বাগ, পোদ এদের গায়ে কত জোর! লাঠি নিয়ে এরা বনের বাঘ তাড়ায়, একদমে লাঙল দিতে পারে চার বিঘে জমিতে। বুদ্ধিতেও যে কিছু কম নয়, মিশন-স্কুলের ছেলেরা তার প্রমাণ। হিন্দুরা এদের ঠেলে দিলো ঘৃণায়, দল-ছাড়া করলো। কি হলো তাতে? হিন্দুর জোর কমে যাচ্ছে, দল হ্রাস হচ্ছে। পরিসংখ্যান বলবে এই জেলায় বর্ণহিন্দু সংখ্যালঘু।

'হ্যাভ্ ইউ ফিনিশড্ ডিয়ার?'—অ্যাগ্‌নেস ডাকলো, চেতন করলো অন্যমনস্ক স্বামীকে।

—'নাঃ, বড় দেরি হলো!'

দশ মিনিট। খাওয়া, কাপড় পরা শেষ। সাইকেল চললো, বেল বাজলো ক্রিং। রূপাতলী যাবে জানা সাহেব।

পথে পড়বে বাবার বাড়ী। এখানে একটু থামবে হৃদয়। সাইকেল রাখবে দেয়ালে ঠেকিয়ে। বাবার স্বাস্থ্যের খবর নেবে, ভাইপোদের গালে দেবে আদর। মা এনে হাতে একটা কৌটা দেবেন—তাতে আছে নিজের তৈরী লবঙ্গলতিকা, হয়তো বা নারকেলের বড়া-ভাজা—সবচেয়ে প্রিয় খাবার ছেলের। মা সানি স্বপ্নার কথা জিজ্ঞেস করবেন। মাথা নাড়বে হৃদয়। আবার সাইকেল,—লম্বা ছুট্। রূপাতলীর চার্চ—কানাই বাগ।

॥ পনেরো ॥

কানাই বাগকে নিয়ে মুস্কিলে পড়েছেন রেভারেণ্ড জানা—হৃদয় জানা। সন্থ ধর্মান্তরিত হয়েছে কানাই, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের আইন-কানুন মানানো মুস্কিল হচ্ছে তাকে।

কানাই বাগের পরিবারের নাম আছে। তার বাপ রমাই ছিল দুর্ধর্ষ 'বাঘা বাগ'। বাঘ ধরে এই নাম রোজগার করেছিল সে। রমাইয়ের যৌবন-বয়সে একবার বাঘের উৎপাত হয়েছিল রূপাতলী গ্রামে। গ্রাম-সংলগ্ন বন হতে বেরিয়ে আসতো বাঘ। বড় বড় গরু ঘায়েল করতে না পারলেও ছাগল, বাছুর নিরাপদ ছিল না চিতার গ্রাস হতে। বাঘ দু-একটা মানুষের বাচ্চাও মারলো। বনের ধারে ছাগল চড়াচ্ছিল তারা।

একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ ভয়ানক হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে তাই সদর হতে এলেন এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট। বাঘ শিকারে এসে সাহেব গুলি ফস্‌কালেন, আর চিতার কামড়ে প্রাণ গেল। আসল সাহেব নয়—বাঙালী সাহেব, এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট মুরারী সেন। এবার সরকারী টনক ভালো করে নড়লো। সরকারী মানুষ খতম হয়েছে যে! তোড়জোড় চললো ভালো করে। নামী-শিকারী আলেকজাণ্ডার গোমেস এলো তার বন্দুক নিয়ে।

জঙ্গল ঝাড় চলছে। একদিকে পথ রেখে, আর তিন দিকের জঙ্গল বেড় দিয়ে ঢাক-ঢোল বাজনা, চীৎকার। বাঘের উদ্দেশ্যে চলছে সকার-বকার গাল, কুকুর দুটোর ঘেউ-ঘেউ—সে এক মজার কাণ্ড। বাঘ বেরুবার পথে, গাছের ডালে শক্ত মাচা বেঁধে বসে

আছে গোমেস সাহেব। হাতে তার সেই বন্দুক, যার গুলিতে ইতিপূর্বে ঘায়েল হয়েছে কমসে কম পাঁচটা বাঘ আর দুটো বুনো শুয়োর।

মুরারী সেনেরও নাম ছিল শিকারী বলে। তিনিও মেরেছিলেন দু-দুটো আদত মানুষ-খেকো। এবারে দুর্বুদ্ধি ঘটলো। অবহেলা করে মাটিতে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়লেন। হাঁটু বেয়ে উঠেছিল জোঁক। সুড়সুড়িতে হাত নড়ে গেল, টিপ ফস্‌কালো। আর যায় কোথায়! রক্তারক্তি করে দিয়ে চিতা পালালো। সাহেবের প্রাণ গেল ক'দিন পর। আরে বাবা! বাঘের দেখা আর বিধাতার লেখা—তাকে কখনো তুচ্ছ করতে আছে? গেলতো প্রাণটা। আর প্রাণ হেন সামগ্রী যা একবার গেলে ফিরবে না শত চেষ্টায়, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রাণ হলেও।

আলেকজাণ্ডার গোমেস পর্তুগীজ। বহুপুরুষ ধরে বাঙালী মিশ্রণের ফলে কেবল পদবী ছাড়া ওদের পর্তুগীজত্বের প্রমাণ কিছু নেই। অবশ্য মেজাজটা দারুন কড়া, আর নাম রাখে সব বিদেশীদের। আলেকজাণ্ডারের বড় সাহস। মস্ত বড় কুমীর মারে চোরা-বালির চরের আলে দাঁড়িয়ে, একটু পা পিছলে গেলে সেখানে মরণ-ফাঁদ পেতে রাখে অথৈ বালি। অনেক শিকারে তার সঙ্গী হয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট ডনোভন সাহেব নিজে। ভয় কাকে বলে গোমেস জানে না। জিজ্ঞেস করলে চোখ পাকিয়ে বলে— 'ভয়টা কিসের? যতদিন গডের মর্জি, পৃথিবীতে থাক্‌মু। কল আইলে তো এটেন্‌শনের সময় পামু না, তবে ভয় ক্যান্‌?'

তা বলে অসাবধান শিকারী নয় আলেকজাণ্ডার। পথঘাট দেখে, নিজের নিরাপত্তা ভেবে-চিন্তে তবেই বন্দুক তোলে।

জঙ্গল ঝাড় দেবার আগেই সাবধান করা হয়েছে গ্রামের লোকদের। বাইরে থাকলে, বাঘের মুখে প্রাণ গেলে, দায়ী নয় সরকার। জোয়ান ছেলেরা গেছে জঙ্গল ঝাড়ায়। এমন মজা

দু-চার বছর পর-পর এক-আধটা আসে। দুর্‌দুর্‌ বুক, বাঘের মুখে পড়বার ভয়, আবার গুলি খেয়ে ছিটকে-ওঠা বনের রাজার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখবার উত্তেজনা,—সে এক বিরাট ব্যাপার। তারপর বাঘ মরলে, সেটাকে বাঁশে বেঁধে, কাঁধে নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ, সহরে নিয়ে যাওয়া, দু'টাকা বকশিস আর এত্ত বড়-বড় জিলিপি।

কিন্তু রমাই বাগ যায়নি জঙ্গল ঝাড়ায়। বয়ে গেছে তার যেতে। কেঁদো-বাঘ, তার জন্য লোক লেগেছে কত! বাঘের গুমরই বেড়ে যাবে। এক লাঠির ঘায়েই রমাই সাবাড় করতে পারে অমন দশটা বড় বিড়াল। তা দলে যায়নি বলে ঘরে ঢুকে বসে থাকবে নাকি রমাই ঠাকুমা বুড়ীর মত? উঠানে বসে বাঁশ চাঁচছিল সে। আকাশে ছিটে ছিটে মেঘ দেখা দিয়েছে। ঘর ছাইতে হবে দু-একদিনের মধ্যে। রমাইয়ের বউও ঘরে ঢোকেনি। স্বোয়ামী যদি উঠোনে বসে থাকতে পারে, সেই বা কেন ঘরে ঢুকতে যায়! একরাশ তেঁতুল নিয়ে বসেছে বউ, বিঁচি ছাড়াচ্ছে নতুন কেনা উজিরপুরী দায়ের সাহায্যে।

ওমা!!! একটা বাঘিনী, সঙ্গে দুটো ছানা। চল্‌ছে দেখ রমাই বাগের উঠান দিয়ে। চিক্কণ, পিচ্ছিল হলুদ বরণ, কালো ডোরা। বাঘ! বাঘের বাচ্চা! এক পলকে লাফিয়ে উঠে রমাই মাছ ধরবার পোলোটা চাপা দিল বাচ্চা দুটোর উপর। প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছিল বাঘিনী। আর কি যেতে পারে? বাচ্চা আটকা পড়েছে যে! বাঘিনী ঝাপিয়ে পড়লো রমাইয়ের উপর। নিমেষের মধ্যে পোলোর মাথায় উঠানে পড়ে-থাকা ভাঙ্গা শিলটা চাপিয়ে ছিল রমাইয়ের বউ, এবার ধারালো তেঁতুল-কাটা দা বসালো বাঘের ঘাড়ে।

হুলস্থুল কাণ্ড। লোক ভেঙ্গে পড়েছে রমাইয়ের উঠানে। বাঘিনীটা শেষ নিঃশ্বাস টানছে আর বাচ্চা দুটো বেড়াল ছানার মতই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ্‌ করছে। বন্দী দশাটা পছন্দ নয় তো। রমাই

বাগ জখম হয়েছে। তবে বউয়ের চোটই বেশী। ঘাড়ের এক খাবল মাংস তো উড়েই গেছে। কোপ খেয়ে বাঘিনীটা ওর দিকেই ফিরেছিল কিনা।

বনের পশু হলে কি হবে! বাঘের বড় বুদ্ধি। বাঘ জানতো খোলা পথে বাচ্চা নিয়ে তারা পালাতে পারবে না। মদ্দাটা তাই খোলা পথে বেরুতেই; যখন সবাই ছুটে এলো বন্দুকের আওয়াজে, তখন অন্যপথে বাঘিনী বেড়িয়েছিল বাচ্চা নিয়ে পালাবার মতলবে। পালানো আর হলো না।

বাঘের বাচ্চা পাঠানো হলো কলকাতার পশুশালায়। রমাই ছুশো টাকা পুরস্কার পেলো; বউ সোনা-বাধানো শাঁখা, ঢাকাই-শাড়ি আর চিকিৎসার সব খরচ, মায় এক বছর ধরে ওষুধ-পথ্য। সার্টিফিকেট লিখে দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজের হাতে। চাকরি হতে পারতো অক্লেশে চৌকিদারের, কিন্তু নিলো না রমাই। কে যাবে রাত ছুপুরে চোর-ছ্যাঁচড়ের পিছনে ঘুরতে।

সেই রমাইয়ের ছেলে কানাই। বাপের মতই ইস্পাতের শরীর। সাহসও কম নয়। রূপাতলীর পাশের জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে, না হলে সেও বাঘ মারতে পারতো—এই এক আফশোষ। তা বাঘ নেই কিন্তু সাপ তো আছে। গাঁ ভরে সাপ মেরে বেড়ায় কানাই। এক বাতিক। সাপের নাম শুনলেই হলো। লোহার কাঁটা পরানো তেল চুকচুকে লাঠি নিয়ে ছুটবে। লোকে নাম দিয়েছে 'কানাই সাপ'। জমি-জিরেত, কাজকর্মে মন নেই। বড় ছেলেটা ষোলোয় পড়েছে, সেই যা পারে করছে। অবশ্য সাপ মেরে কানাই বকশিস-টকশিস পায় মাঝে মাঝে।

ভাদ্রের শেষে সেবার কানাই পড়লো জ্বরে। কাঁথা দাও, কম্বল দাও, কেঁপে-কেঁপে তবু জ্বর বাড়তেই লাগিলো। ভারি জ্বর। গায়ে ধান দিলে খই ফোটে। ছুই চোখ জবা ফুল।

চার মাইল হেটে সদরের হাসপাতালে যায় কানাইয়ের মা। বেলা ন'টা হতে বসে থেকে-থেকে, সূর্য যখন মাথার উপর, তখন ওষুধ পায়। জ্বরের ওষুধ। কুইলিন বড়ি, তেতো, বিষ। তাই খাওয়ায় ছেলেকে। রেঁধে দেয় খোরা-খোরা শটীর পালো।

অনেক ভুগে দু' মাসের মাথায় নির্জ্জ্বরী হলো কানাই। ছেলের দিকে চেয়ে মায়ের চোখের জল আর থামে না। হাড়-মাস সার হয়েছে তার ধুমসো জোয়ান কানাই। চোখ গর্তে, কণ্ঠার হাড় এত বড় হয়ে জেগেছে। খাওয়ায়ও রুচি নেই তার। একরত্তি চ্যাং মাছের পাতুরি দিয়ে যে ছেলে এক হাড়ি আউস চালের ভাত খেতো, সে মোটে ভাতের পাতে বসতে চায় না। কেঁদে-কেটে মরতে বসলো কানাইয়ের মা।

গ্রামে ছিল আন্দি বুড়ী। তিন কাল দেখেছে সে। কত বয়েস কেবা জানে! শণের নুড়ি চুল। কিন্তু কাঁকাল সোজা, চোখে বারো বছরের মেয়ের তেজ। আর কি বা গলার আওয়াজ! বাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে অনায়াসে।

এমন অঘটন কিন্তু ঘটেছে দেবতার দয়ায়। আন্দি বুড়ীর আছে মনসার পাট। মা মনসা, শিবের মেয়ে, সাপের দেবী। চাঁদ-বেনের দর্প ভেঙ্গেছিলেন মা মনসা। আন্দির বাড়ীতে সেই জাগ্রত দেবতার সেবা। বারো মাস সেখানে পূজা হয়, পড়া হয় মনসার পাঁচালী—যে পাঁচালী লিখে গেছেন ফুল্লশ্রী গ্রামের কবি বিজয় গুপ্ত।

"শ্রাবণ পঞ্চমী নিশি
ঘুমায় ভুবন।
হেন কালে বিজয় গুপ্ত
দেখিলা স্বপন॥"

কি স্বপ্ন দেখলেন বিজয় গুপ্ত? দেখলেন সর্প-সিংহাসনে এক দেবী। মাথায় সাপের মণি, থরে-থরে পদ্মফুল ঘিরে রয়েছে

তাঁকে। দেবী বিজয় গুপ্তকে তাঁর মহিমা নিয়ে কাব্য লিখতে বললেন। বাংলার মেয়ে-বউরা পড়বে মা-মনসার মহিমার কথা। জানবে বাংলার মেয়ে বেহুলাকে, মরণ-সমুদ্র পার হয়ে অমৃতলোকে পৌঁছে, সে ফিরিয়ে এনেছিল মৃত স্বামীর প্রাণ।

কি অপূর্ব বেহুলার কথা! বাসর ঘরের নব বধূকে মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিল দেবতার কোপ। লাল চেলীর আঁচলে বাধা পঞ্চফল। সিঁথি-মৌড়ের একটি কণা খসে নি। নতুন-পরা সিঁদুর, নতুন শাঁখা-লোহার এয়োতি। সাপে-কাটা স্বামী লক্ষ্মীন্দরকে ভাসিয়ে দিতে হবে নদীর জলে। সবাই জড়ো হয়েছে নদী তীরে, গুঞ্জরী নদী। কলার ভেলা, তাতে ভাসাবে লখাইয়ের তরুণ নধর দেহ—বিষে এখন নীল হয়ে গেছে। এই-ই রীতি। সাপে কামড়ালে পোড়াতে নেই। নদীর জলে দেহ ভাসানো নিয়ম। ভাসতে-ভাসতে চলবে শব, যদি চোখে পড়ে জ্ঞানী-গুণী সাপের ওঝার—সর্প-বৈদ্যের, তাঁরা থামাবেন ভেলা, বিষ নামাবার চেষ্টা করবেন। ভাগ্যে থাকলে আবার ফিরবে মৃত দেহে প্রাণ।

অমন ভাগ্যের আশা নেই চাঁদ-সওদাগরের, লখাইয়ের বাপের। দেবতার সঙ্গে ঝগড়া তাঁর। সর্বস্বান্ত হয়েছেন মনসা দেবীকে অমান্য করে। গেছে ছয় ছেলে, রাজার মত ছয় কুমার আর বাণিজ্য-তরী সপ্তডিঙা মধুকর। সর্বশেষ লক্ষ্মীন্দর! তাঁকেও হারালেন। কঠিন প্রাণ চাঁদের, এখনো ভয় নেই। নেই নতি স্বীকারের আকৃতি। নদীর পাড়ে সেই বিরাট পুরুষ হেকে-হেকে বলছেন—

"যেই হাতে দুর্গারে
দেই ফুল পানি।
সেই হাতে পুজিব না
লঘুজাতি কানি॥"

চাঁদ মা-চণ্ডীর সেবক। মনসা দুর্গার সতীন-ঝি, মায়ের শত্রু! কে তাঁর পূজা করবে? চাঁদের হুংকার বুঝি গিয়ে পৌঁছাচ্ছে মর্তের ওপারে, মনসার মন্দিরে, দেবীর তৃতীয় নয়নে ঘনিয়েছে বুঝি অপ্রসন্নতা।

ভেলা জলে নামানো হলো। ওকি! ভেলায় গিয়ে উঠছে যে নতুন-বউ বেহুলা।

কোথায় যাবে ও শবের সঙ্গে? পাগল নাকি! কপালে যা যা ছিল, তাতো ঘটলো। এখন ঘরে থাকো ছ'জায়ের মত। দেব-সেবায়, ধর্ম কর্মে মন দাও। পরজন্মে এয়োতি অক্ষুন্ন থাকবে। কিন্তু শত অনুনয়-বিনয়েও টললো না তো বউ। বেহুলা বিধবা হয়ে থাকতে পারবে না ঘরে। সে যাবে স্বামীর সঙ্গে, নদী হতে সমুদ্রে, তারপর মত্যুনদী বৈতরণী পার হয়ে অমৃত লোকে। দেবাদিদেবের পায়ে ভিক্ষে চেয়ে নেবে স্বামীর জীবন।

অবাক হলো চম্পকনগরীর লোক। উজানী নগরের সায়-বেনের ঝি বলে কি? মরার সঙ্গে ভাসবে জ্যান্ত মানুষ! ফিরিয়ে আনবে স্বামীর প্রাণ!

তাই হলো। কত বাধা-বন্ধ, দুঃখের পাথার পার হয়ে বেহুলা, পৌঁছালো স্বর্গপুরে। মর্তের নাচুনী মেয়ে বেহুলা তার নাচের নৈবেদ্যে তুষ্ট করলো নটরাজ মহাদেবকে। মনসা চাইলেন প্রসন্ন দক্ষিণ নয়নে। সব ফিরে পেলো বেহুলা। স্বামীর জীবন, ছয় ভাশুর আর ঐশ্বর্য। এবার দেবীর মহিমার কাছে আনত হলেন চাঁদ-সওদাগর।

"হরি হরি বল সবে
ঘটে দাও ফুল পানি।
পাঁচালী সাঙ্গ হইল রে ভাই
গায়নেরে দাও খুনি॥"

হারিকেনের আধো-আধো আলোয় আন্দির উঠানে বসে মা

মনসার পাঁচালী শোনে সব মেয়ে-বউ শ্রাবণ মাস ভরে। চোখে তাদের যত জল, বুকে তাদের তত আশা। রোগে শোকে তারাও যুঝবে মরণের সঙ্গে। বেহুলা যোঝে নি ?

পাঁচালী পড়া সাঙ্গ হলে, মা-মনসার ঘটে প্রণামী দিয়ে যে যার চলে যায় নিজের ঘরে। সারারাত ধরে বুকে বাসা বেঁধে থাকে এক মেয়ে আর তার মৃত্যুজয়ের কাহিনী।

গাঁয়ে লোকের অসুখ হলে সবাই মানত করে মা-মনসার পাটে। ঘটের ফুল জল নিয়ে দেয় রোগীর মাথায়, মুখে। রোগ আরাম হলে পূজো দেয় পাঁচ সিকের বাতাসা, ধুনো পোড়ায় মাথায়, হাতে ধুনচি নিয়ে। না, পাঁঠা মানত করে না কেউ। আন্দি বুড়ির মানা। সে বলে—

'জীবের জীবন ভিক্ষে চেয়ে জীবহত্যা মানত করো না বাছা। মায়ের আমার অভাব কিসের যে একটি জীবন না নিয়ে আর একটি প্রাণ মঞ্জুর করতে পারবেন না ? চাঁদ-বেনের ছেলে নিয়ে ছিলেন ? সে তো তাঁর দেমাকের শাস্তি দিতে।

সবাই তাই বললো, 'আন্দি বুড়ীর থানে যাও কানাইয়ের মা। অত মা-মনসার বাহন হত্যা করেছে তোমার ছেলে, মায়ের কোপে তার শরীর ভেঙ্গেছে। মাকে পূজো দাও, কাঁদো, গড়াগড়ি দাও মায়ের উঠানে, নাক-কান মলা খাও। দেখবে ছেলে তাজা হয়ে উঠেছে। অমন চাঁদ-বেনেকেই ক্ষমা করলেন মা, আর তোমার কানাইকে করবেন না এও কি একটা কথা! বউকে বল মাকে ধরতে।'

তাই করলো কানাইয়ের মা। শাশুড়ী আর বউ গিয়ে পড়লো আন্দি বুড়ীর পায়ে। অনেক দোষে দোষী কানাই। মেরেছে মায়ের বহু বাহন। জাতি, খয়া, গোখরো, দাঁড়াস—বহু সাপ মরেছে কানাইয়ের লাঠির ঘায়ে। আর কানাই সাপ মারবে না।

মায়ের থানে শপথ নেবে, ধূপ পোড়াবে। দরজার আগলটি খুলে দাও, মায়ের দয়া মঞ্জুর করো।

আন্দির মন ভিজলো। মায়ের দাসী নেতার মনও তো ভিজেছিল বেহুলাব দুঃখে। কেবল ঘটের ফুল-জল নয়, পাঁঠীর টাটকা দুধ, প্রসাদী-ফল-সন্দেশও দিতে লাগলো সে কানাইকে। দিনে দিনে বল পেলো ছেলে। আহাবে রুচি। খাল বিল হতে নিজেই মাবতে পারছে মাছ। মাসেব শেষে চালে টান পড়লো ঘবে। আহা! তা পড়ুক। পড়শীবা ধাব দিতে এগিয়ে এলো। রোগ-পীড়ায় কার না ধার-দেনা হয়? আব কানাই কি কেবল বমাইয়েব ছেলে? বঙ্খি খুড়ো, জনাই মেশো কেউ বুঝি নয় তাব?

শ্রাবণ মাসেব পঞ্চমীতে হাট হতে তিলুয়া, কদমা, ফাঁপা-বাতাসা এত্ত বড়-বড় কিনে আনলো কানাই। ধূপ পোড়ালো এক সের, নাক-কান মলা খেলো। সাপ মারা—গো হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা।

ভালোই কাটলো কিছুদিন। জমি-জমার কাজে মন দিল কানাই। সংসারে এলো সচ্ছলতা। বউকে শাশুড়ী গড়িয়ে দিল পাশী মাকড়ি, মা-মনসার থানে দিল চরণামৃত রাখবাব রুপোর ঘটি।

খ্রীষ্টান কি হোত কানাই? হতো না। সখ নেই তার পেন্টুলে আর চাকরিতে। ঠেঙ্গিয়ে যে জাত হতে তাড়িয়ে দিলেন জমিদার কানাইকে। রমাই বাগের ছেলে কানাই বাগ, যার লাঠির সামনে দুশো লোক হটে' যেতো, তার ছেলে সইবে জমিদারের ঠেঙ্গানি? ধুত্তোরি তোর হিঁদু জাত! একেবারে রাজার জাতে উঠলো কানাই। আর ট্যা-ফোঁ চলবে না বাবু মশাইয়ের, মিশনের পেয়াদা এসে দাঁড়াবে দরজায়, লাল-মুখো ফাদার।

ঘটনাটা হলো কি—একদিন বিহান বেলায় জমিতে যাবার

আগে ছুটি পান্তা মুখে দিতে বসেছে কানাই। জমিদার বাবুর তলব এলো।

—'চল, বাবু-মশাই ডেকেছেন'।

জমিদার—মালিকের ডাক। সেই ভোরে গেল কানাই, আর ফিরে এলো রাতের বেলা কাঁপতে-কাঁপতে। সর্বাঙ্গে কালশিরে,—চাবুকের দাগ। ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছেন জমিদার শক্ত করে বেঁধে রেখে। দোষ? কি অপরাধের এমন শাস্তি?

সাপের গর্ত দেখা গেছে বাবুর বাগানে। বাবু কানাইকে বললেন গর্ত খুলে সাপ মারতে। সাপ! মা-মনসার কোপে আবার পড়লে ছায়ে-মূলে সর্বনাশ হবে তার। সে তো যেতে বসেছিলো যমের ছুয়ারে। মায়ের দয়ায় কোনোমতে প্রাণটা ফিরেছে। আবার যদি দোষ করে, মায়ের কপালের আগুন ছাই করে দেবে কানাইদের সকলকে।

বাবু মানলেন না। কানাই মনসার কোপে পড়লে তাঁর কি? তাঁর বাগানে যে সাপের বাসা। জমিদারের ছেলে-মেয়ে বেড়ায় সেখানে, খেলা করে। ফুল তোলেন সকাল বেলায় বুড়ো মা। সাপ মারতেই হবে কানাইকে। প্রথমে মিষ্টি কথা, ধমক, তারপর চাবুক। সন্ধ্যের পর বাবু ভিতর মহলে চলে গেলে, মায়ের হুকুমে পাইকরা ছেড়ে দিয়েছে কানাইকে।

ধুঁকতে-ধুঁকতে কানাই এসে সেই যে কাঁথা মুড়ি দিলো, আর উঠলো না ছ'দিনের আগে। তিন দিনের দিন উঠে, না মুখে জল, না পেটে ভাত। সোজা ঢুকলো এসে চার্চে। সেদিন রবিবার। জানা সাহেব এসেছেন সারমন দিতে।

'মুই খিরিষ্টান হমু ফাদার।'

হৃদয় চমকালেন। খ্রীষ্টান হবার হিড়িকটা ইদানীং একটু কমেছিল।

—'কেন রে তোর আবার খ্রীষ্টান হবার সখ হ'ল কেন? হিন্দু আছিস। মন্দ কি!'

হিন্দু!! থু থু। একরাশ থুতু ছিটালো কানাই।

—'হিন্দু জাতে মুই লাথি মারি।'

খ্রীষ্টান হলো কানাই বাগ। বেশ ছিল। হঠাৎ তাকে নিয়ে গোলমাল বেঁধেছে। কানাই নাকি হিন্দুধর্ম মানছে এখনো। রাখে মনসার ছবি। বাড়ীতে ফণী-মনসার গাছ ঘিরে সুন্দর বেদী; ফুল দেয়, আলো দেখায়। নালিশ এসেছে কানাইয়ের নামে। ফাদার স্ট্রং খোঁজ নিতে বললেন রেভারেণ্ড জানাকে বিশদভাবে।

অগত্যা হৃদয়কে আসতে হলো কানাইয়ের বাড়ী। পাদ্রী সাহেবের সাইকেলের পিছু-পিছু যে ছোড়াগুলো ছুটছিল, তারাই হদিস দিল কানাই বাগের বাড়ীর পথের।

'ঐঃ বডগাছডার বোগল দিয়া, হোগলা ঝাড়ের হে মুড়ায়, হের বাড়ী।'

গোবর নিকানো ঝক্‌ঝকে উঠান। গোলপাতার বড় দু'খানা ঘর। ধানের মড়াই আছে একটা। নেহাত হা-প্রত্যাশার গৃহস্থ নয় কানাই বাগ। জমি আছে তার পাঁচ বিঘে। গায়ে অসীম জোর। জন-খেটেও রোজগার করতো প্রচুর। আর এখন তো ধানকলে চাকরিই পেয়েছে তিরিশ টাকা মায়নায়।

সাহেবকে দেখে ব্যস্ত সবাই। জলচৌকি পেতে দিল সাহেবকে। বিড়ি, দিয়াশলাই হাজির। হাঁটু উঁচু করে বসলো কানাই, তার মা আর ছেলে। বৌ আড়-ঘোমটা টেনে দাঁড়ালো দরজার ঝাপের আড়ালে।

জানা দেখলেন ফণী-মনসার বেদী।

—'এটা কি বাগ?'

—'আইজ্ঞা সপ্প-মনসার গাছ। মা-মনসার আসন।'

সবিনয়ে উত্তর দিলো কানাই।

'কিন্তু এ তো চলবে না কানাই। তুমি এখন খ্রীষ্টান, হিন্দুধর্মের রীতি-নীতি মানছ কেন?'

প্রশ্ন শুনে কানাই তাকালো হতবুদ্ধি চোখে, আর কানাইয়ের মা জ্বলে উঠলো।

'দেখো সাহেব! আমরা জাত ছেড়েছি, কিন্তু ধর্ম ছাড়ি নি। আমার ছেলে মা-মনসার দুয়োর ধরা। খিষ্টান হই, মুচুরমান হই, মাকে অমান্যি করতে পারবো না; পারবো না।'

কানাইও মাথা নাড়লো জোরে!

হৃদয় বুঝলেন যে মা মনসাকে ক্রুদ্ধ করবার ভয়ে জমিদারকে মানে নি কানাই, তাকে হটাবার সাধ্য যিশুখ্রীষ্টের নেই। কানাই জাত দিয়েছে, ধর্ম দেয়নি। তার ধর্ম বাসা বেঁধে আছে তার সংস্কারের মধ্যে। জন্মসূত্রে পাওয়া যে তামস অন্ধ সংস্কার সঞ্চারিত হচ্ছে রক্তের মধ্যে।

বিলুর সঙ্গে ঝগড়া বেঁধেছে ঠাকুমার। প্রচণ্ড তর্ক। ঠাকুমার কেষ্ট-ঠাকুরকে ছুঁয়ে দিয়েছে রমণী। বেচারী সকাল হতে গাল খেয়ে কেঁদে-কেঁদে মরছে। এখন পুরুত মশাইয়ের নির্দেশ এসেছে, পঞ্চগব্য দিয়ে ঠাকুরকে স্নান করালেই শুদ্ধ হবেন তিনি। মরি বাঁচি, রমণী ছুটলো ঐ সব পবিত্র দ্রব্যের যোগাড়ে। হয়তো নরকের ফাড়াটা কেটে যাবে এ যাত্রা।

বিলু এসে সব শুনে মহা হাঙ্গামা বাঁধিয়েছে। হাঙ্গামা বাঁধাতে ওস্তাদ তো সে।

—'এঃ, এত ছোট তোমার ঠাকুর ঠাকুমা? তিনি ছোঁয়া যান, অপবিত্র হ'ন, আর গোবর-টোবর না মাখালে জাতে উঠতে পারেন না? ওঁকে তবে পূজো কর কেন? ওঁর চেয়ে তো আমার নেম্‌মা মালী বড়। কখনো কিছুতে অপবিত্র হয় না।'

ঠাকুমা ভীষণ চটেছেন।

—'এসব তোকে শেখায় কে শুনি? তপুতো বিদ্যের জাহাজ, কখনো বলে এমন কথা? দু'পাতা না পড়েই তুই নাস্তিক। বউ শোন তোর বিলুর কথা।'

বিলু হেসে উঠলো।

—'দেখছো তো তোমার ছোট ঠাকুর তোমাকেও কেমন ছোট করে দিলেন? বরাবর আমি তোমার বিলু, যেই ঝগড়া লাগলো, অমনি মাকে দিয়ে দিলে। বেশী রাগলে যমকে দিতে।'

—'ষাট! ষাট!' চোখে জল এলো ঠাকুমার।

জড়িয়ে ধরলেন বিলুকে।

—'ব্যাপার কি?' জানতে চাইলো সদ্য বাড়ী-ফেরা তপন।

—'শোন্ তপু!'

—'শোনো মেজদা!'

এক সঙ্গে শোনাতে চাইলো বিলু, ঠাকুমা দুজনে।

তপু শুনলো সব, হাসলো।

—'তুই স্যারের ওখানে রবিবারে যাস না কেন?'

বিলুকে জিজ্ঞেস করলো তপন।

—'অনেক কিছু বুঝতে পারবি তা'হলে।'

—'কি আশ্চর্য মেজদা। আমি তো প্রায় রবিবার যাই। দেখ নি আমাকে? হালুয়াটা বানায় চমৎকার! সূর্যদা ভাতও খাইয়ে দেন কত দিন।'

—'উঃ, বিলু! হালুয়া! ভাত!!'

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে গেল তপন।

ক্ষুণ্ণ হলো বিলু। কি ভাবলেন মেজদা! বিলু পেটুক! খেতেই ভালোবাসে! কিন্তু গীতার ব্যাখ্যা শুনবার সময় কই তার? রবিবারে তাকে যেতে হয় সেই পরেশ সাগরের পাড়ে হেমেন বাবুর বাড়ী,—বি. এম. কলেজের কেমিষ্ট্রির স্যার হেমেন

রায়। বিলু অবশ্য ইস্কুলেই পড়ছে এখনো। কিন্তু আর ক'দিন? সামনের বছরেই তো কলেজ। এখন হতে বিজ্ঞান-টিজ্ঞান চর্চা না করলে বুঝবে কি ছাই ইংরেজী লেকচার।

আনমনা হয়ে দঁড়িয়েছিল বিলু।

'—বিলু শোন! এই দেখ।' মা ডাকলেন।

এগিয়ে গেল বিলু। মায়েয় হাতে জবা ফুল। লাল আর পাণ্ডু বর্ণে মিশে গোলাপী। বিলুর পরীক্ষার ফল।

—'তোর গাছের।' মা হাসলেন।

—'উঃ! গ্রাণ্ড! দেখছো তো মা বিজ্ঞানের কাণ্ড? মেজদা!'— মায়ের হাত হতে ফুল প্রায় কেড়ে নিয়ে ঘরে ছুটলো বিলু। মায়ের চোখ স্নেহ-সজল। পাগল! একেবারে পাগল ছেলেটা।

—'কি বলছ রমনী?'

—'আইজ্ঞা লোক আইছে।'

—'কে? ও, যজ্ঞেশ্বর!'

হৃষ্ট-পুষ্ট এক পুরুষ প্রণত হলেন মায়ের পায়ে। গায়ের রং কালো। মাথায় চুল এলো-মেলো। উজ্জ্বল চোখের তারা। যজ্ঞেশ্বর—বাংলার চারণ কবি মুকুন্দ দাস।

—'চল বাবা ঘরে যাই।'

ঘরে ঢুকে মুকুন্দ দাস বসলেন খাটের উপর। মা মেঝেতে, মোড়ায়।

—'তারপর? সব শেষ হয়ে গেল?'

—'শেষ হলো মা।'

গম-গম করে উঠলো স্বর, যা হাজার লোক শুনতে পায় গানের আসরে।

—'দেওয়ালির দিন মা। সমস্ত বাংলাদেশ তাঁর বিদায় যাত্রায় আলো জ্বালিয়েছিল।' —বললেন মুকুন্দ দাস।

নমস্কার জানালেন মা মাথা নীচু করে। কিছুদিন হলো

জেলার প্রাণ অশ্বিনী বাবুর লোকান্তর হয়েছে। অশ্বিনী দত্ত চলে গেছেন তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে, যে ভূমি "লাঠির ঘায়ে পূণ্যে বিশাল" হয়েছিল। আর তাঁকে দেখা যাবে না রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে, পিতৃনামে প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন কলেজে।

—'তিনি চলে গেলেন, কিন্তু কাজ থামলে চলবে না।'

আবার বললেন মুকুন্দ দাস।

—'কাজ থামবে কেন? তোমরা রয়েছ—যোগ্য ছেলে। দেশভরা সমস্ত ছেলেই তো তাঁর। তোমার নতুন গান শুনলাম বিলুর মুখে।'

—'নতুন গান? কোনটা? জানতে চাইলেন মুকুন্দ।'

পিছনে এসে কখন দাঁড়িয়েছিল বিলু। গেয়ে উঠলো।

'জাগ গো জাগো জননী'—

আর শেষ করলো—

'মুকুন্দের কথা রাখো—
করুণা নয়ণে দেখো,
অকূলে পড়েছি মোরা
তার দীন-তারিণী।'

—'বাঃ, বিলু ভাই! সুন্দর গলা হয়েছে তো তোর। বিলুকে কাছে টেনে আনলেন কবি।

—'পরীক্ষার পর চল্ আমার সঙ্গে। বাংলা দেশের প্রত্যেক সহরে, গ্রামে গিয়ে বল্‌বি—

'জাগ গো, জাগো জননী'—

সোৎসাহে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে গিয়েই চমকালো বিলু। যজ্ঞদাদার প্রস্তাব মনোরম কিন্তু যাবে কি করে বিলু! খাস মহলের কমিশনার হোসেন আলি সাহেব বলে রেখেছেন তাকে নিয়ে যাবেন চর নীলকমলে পরীক্ষার পর। সে এক অপূর্ব রাজ্য। নতুন চর জেগেছে, পলি মাটিতে সবুজের বন্যা।

হরিয়াল, বন-তিতিরের অন্ত নেই। সাদা বক থোকা-থোকা। মস্ত বড় বড় কুমীর চরের রোদ পোয়াতে আরামে শুয়ে থাকে। তাদের দাঁতের পোঁকা খুটে খুটে নিঃশেষ করে বকের দল.। এই এত্ত বড় সাপ; মাঝে-মাঝে নদী সাতরেই চরে চলে আসে স্নুন্দর বনের বাঘ।

এই রূপকথার দেশে, মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ির শক্ত বেড়া-দেওয়া খাস মহলের কাছারি-বাড়ী। চরে 'গোর কাঠী' নেয় মুসলমানেরা। চরের জমিতে তারা মোষ চড়ায়, বাথান বাঁধে, তাকেই বলে 'গোর কাঠী'। তাদের কাছে চর ইজারা দেবার জন্য চর নীলকমলে আফিস বসে খাসমহলের। তিন ইঞ্চি পুরু মাখন মাখা ভঁইষা দৈ, অজস্র মাছ আর বন-মুরগী খেয়ে মোটা-সোটা হয় খাস মহলের কর্মচারী। খেলাধূলো করবার, বেড়াবার জায়গাও বিস্তর। বন্দুক ছুড়লো, তো পড়লো সরষেফুলের মধু-খাওয়া হলুদ মুরগী। সূর্য্য ওঠে নদীর জলে স্নান করে, আবার নদীর জলেই টুপ্ করে ডুবে যায়। সেখানে মস্ত বড় আকাশ আর তার রং নাকি এমন নীল যে হাতে ছুঁলে, সে রং লেগে যাবে। মুস্কিল অবশ্য আছে মস্ত বড় একটা,—সন্ধ্যা না লাগতেই ঘরে খিল। তখন চোখ বড় বড় করে, শোনো রাজ্যের ভূতের গল্প। সবাই যেন কত দেখেছে ভূত। বিলু তো কত চেষ্টা করেও একটা ভূতের ছায়াও দেখলো না। অমাবস্যা রাতে গোরস্থানের কাছে, রাত ন'টার সময়ও ভূতের সাড়া পাওয়া যায়নি।

হোসেন সাহেবের সঙ্গে বিলু যাবে ঠিক হয়ে আছে। অস্নুবিধা? কিছু নেই। সব হিন্দু কর্মচারী ওখানে। বিলুতো তাদের পাকেই খাবে। ঠাকুমার বিশ্বাস নেই বিলুকে একতিল। ভাবেন সে ম্লেচ্ছ, মুসলমানের ছোঁয়া খেতে পারে অনায়াসে। নিশ্চয় ফিরে এলে খাইয়ে দেবেন পঞ্চগব্য। বিশ্রী!

তবে কি যজ্ঞদাদার সঙ্গেই যাবে নাকি? তাতেও মজা অনেক। বড় বড় কারবাইডের আলোয় দিন-করা রাতের আসর। অচেনা সব অদ্ভুত মুখ। গেরুয়া আলখাল্লার উপর কোমরে চাদর বেঁধে, বুকে সারি-সারি মেডেল, পাগড়ি মাথায় আসরে ঢুকবেন যজ্ঞদাদা। দরাজ গলায় গাইবেন—

"নদীতে বান এসেছে
খুলতে হবে নাও,
তোমরা এখনো ঘুমাও।"

টান হয়ে বসবে সব ঝিমিয়ে-পড়া মানুষ, জ্বল-জ্বল করবে চোখ, বুকের রক্ত উদ্দাম।

বিলু ঠিক করতে পারছে না কি করবে। কোনটা ভালো! হোসেন সাহেবের সঙ্গে ভয়ঙ্করের রাজ্য চর নীলকমলে যাবে, না যজ্ঞদাদার সঙ্গে দেশের লোককে জাগাতে লেগে যাবে। নাঃ, নিজে ঠিক করতে পারবে না সে বিষয়টা। দুটোই সমান লোভনীয় কিনা। ঝুলন সিংএর পরামর্শ নিলে কেমন হয়? কিন্তু ওতো কেবল মোটা মোটা আটার রুটি খেতে জানে অড়হরকা ডাল দিয়ে। ওর কি আর বুদ্ধি হবে! খাটিয়াটা পর্যন্ত ভাঙ্গা। সারাতে বললে—এক কথা রোজ—

—'আরে বিলু ভাই। টাকা পাবো কোথা? বেবাক লইয়া গেল মোদী।'

মাও ভাবছিলেন। ভাবছিলেন দেশের কাজ কি বন্ধ হয়ে যাবে? তাই কি যেতে পারে! পরাধীনতার দুঃখ যে বাসা বেঁধেছে মর্ম্মমূলে। পলে পলে মানুষ অনুভব করছে দেশ আর তার নেই। বাংলার কবি কত দুঃখেই না গান বেঁধেছেন—

"এই যমুনা গঙ্গা নদী
তোদের ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে
জাহাজ কেন বয়!"

সমস্ত দেশ ভরে একটি প্রস্তুতি চলছে। কাশীপুরে মস্ত বড় আশ্রম গড়ে তুলছে যজ্ঞেশ্বর। মাতাজি সরোজিনী দেবীকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে দেশের মেয়েদের সত্যি-সত্যি মা মানাবে। ওর যে বিশ্বাস নেই আধুনিক শিক্ষায়। মেয়েদের ডেকে-ডেকে বলছে—

"মেয়েদের সব হাই ইস্কুলে
তারা মা হবে না কোনো কালে,
তাই তোরা ভাই আগে থাকতে
মায়ের জাতি গড়ে তোল।"

শঙ্কর মঠে ছেলেরা এসে জ্ঞানের চর্চা করছে। রামকৃষ্ণ মিশনের ছেলেরা সেবাব্রতী। যার কেউ নেই, রোগে, দুঃখে, অভাবে তার মস্তবড় সম্বল মিশনের ছেলেরা। পাড়ায়-পাড়ায় শরীর চর্চার আখড়া। ছেলেদের বুকে কত জোর। মা দেখেন আর ভাবেন—তোমরা অচেনা নও। নতুন নও। তোমাদের দেখেছি একহাতে গীতা নিয়ে, আরেক হাতে বোমা বানাতে, ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছ তোমরা অকাতরে। মা জেনেছেন— তারাই, সেই সব বীর ছেলেরাই আবার ফিরে এসেছে। তারা যে অঙ্গীকার করে গিয়েছিল ফিরবে। বাংলার মাটিকে ভালোবেসে তাদের আশা মেটে নি, তাইতো ফিরেছে নতুন রূপে, গলায় ফাঁসির দড়ির দাগ না থাকলেও চোখে সেই তেজ যা মা দেখেছেন বউ-কালে।

এখনো কি এরা বোমা বানাচ্ছে? বানালেও মা জানেন না, কিন্তু দেখছেন, আভাস পাচ্ছেন এক মহা সম্ভাবনার। এমনি এক সম্ভাবনা দেখেছিলেন তিনি এক বৈশাখের সন্ধ্যায়। আকাশ ঘন মেঘে কালিবর্ণ। ছিটেফোঁটাও বাতাস নেই। সমস্ত পৃথিবী তার গাছপালা নিয়ে দম বন্ধ করে যেন একটা যুদ্ধ দেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আর তাই হলো। একটু পরেই শুরু হয়ে গেল প্রলয়-

তাণ্ডব। সেকি তার প্রবলতা, কোনো শক্তি নেই রুখতে পারে।

এখনো মা দেখছেন দেশের সেই অবস্থা। ছেলেরা, মেয়েরা তৈরী হচ্ছে। এরা যেদিন যুদ্ধ দেবে, হেরে যাবে ইংরেজ। হারতেই হবে যে তাকে। একটা গোটা দেশকে কি কেউ কখনো শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে!

ভাবনার সাগরে তলিয়েছিলেন মা। মুকুন্দদাস চলে গেছেন, সঙ্গে গেছে বিলু ছুটির দিনটা কাটাতে। রমণীর হুস্‌হাস নাক টানার শব্দে মা ফিরে এলেন তাঁর সংসারে।

—'কাঁদছিস্ কেন?'

'ঠাক্‌মা পুরুতমশাইরে মানা করছে ঠাকুর শোধন করতে। আমার পাপ গেল না।'

একটু ব্যস্ত হলেন মা। জানেন শাশুড়ীর গোঁড়ামি। কিন্তু বিলুর উপর রাগ করেই কি তবে ঠাকুর শোধন করলেন না? এমন তো কখনো হয় না।

ঘর হতে বেরিয়ে, বারান্দা ঘুরে, ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন মা। নবদুর্বাদল কৃষ্ণমূর্তি। হাতের বাঁশি অধরে ধরেছেন, বুঝি তাতে এমন সুর বেজেছে যে বিশ্বের সমস্ত রাধা রাতের কালো, পথের কাঁটা, অপবাদ-পরিবাদ সব তুচ্ছ করে অভিসারে না বেড়িয়ে পারে না। শাশুড়ী বসে আছেন মেঝেতে।

—'পুরুতমশাই চলে গেলেন মা? ঠাকুর শোধন করাবেন না?'

হৈমবতীর প্রশ্নে চোখ তুললেন সুরসুন্দরী।

—'না বউ! বিলু ঠিকই বলেছে। ভেবে দেখলাম ঠাকুর কি কখনো ছোঁয়া যেতে পারেন। কত রাখালের এঁটো খেয়েছেন, কাঠ বয়েছেন, বাঁক বয়েছেন গোয়ালার।

—'তারা যে ভক্ত ছিলেন মা।'

এবার ঝাঁকরে উঠলেন ঠাকুমা। ফিরে এলেন নিজের মূর্তিতে।

—'কি যে তোর বুদ্ধি বউ!' রাখাল, গোয়ালারা ভক্ত ছিল? আর রমণী বুঝি শত্রু? সেই বিহানে উঠে বুড়ো ফুল এনে দেয় না? কত কাঁটা ফুটেছে না ওর পায়ে? চরণামৃত মুখে না দিয়ে খায় কোনো দিন অন্যকিছু? আমার যেমন কপাল! ভীমরতিতে ভাবলাম, রমণী বুঝি ছুঁয়ে অপবিত্র করে দিল ঠাকুরকে। তা আমি যেন বুড়ো হয়েছি। ভালো-মন্দ, বুদ্ধি-বিবেচনার মাথা খেয়ে বসে আছি। তোর আক্কেলটা কি? তুই বুঝিয়ে বলতে পারলি না? ভাগ্যিস বিলু ছিল, নয়তো নরকে যেতে হতো না আমাকে?'

এবার নরকের ভয় শাশুড়ীর। মা হাসলেন।

—'তোরও ছুটী নাকি তপু? খিষ্টান-ইস্কুলের আবার ছুটী কিসের?'

ঘর হতে বেরিয়ে আসা তপনকে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুমা।

—'গুড ফ্রাইডের ছুটী ঠাকুমা, একদিন নয়, সাতদিন।' দাঁড়ে-বসানো টিয়াটার ল্যাজ টেনে দিল তপন।

—'সেটা আবার খিষ্টানদের কিসের পরব?'

—'পর্ব? এই দিন যিশুখ্রীষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন।'

—'কপাল! প্রাণ আবার দিতে গেল কেন সে?'

ঠাকুমার মেজাজ তখনো শান্ত হয় নি।

হেসে বাইরে বেরিয়ে গেলো তপন।

ফ্রাইডে—শুক্রবার। পৃথিবীর লোককে ভালোবাসবার অপরাধে সেদিন শাস্তি পেতে হয়েছিল যিশুখ্রীষ্টকে। মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল রাজা—আর সেকি মৃত্যু! কাঠের দণ্ডে হাত-পা লোহার পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়েছে, রক্ত ঝরছে স্রোত হয়ে, তবু মুখে ক্ষমার প্রসন্নতা। এপ্রিল মাসের বেলা এগারোটার রোদের ঝক্‌ঝকানির মধ্যে তপন প্রত্যক্ষ করলো নীল চোখ, গেরুয়া চুলের

দীর্ঘদেহ যুবককে। কাঠের দণ্ড বহে নিয়ে চলেছেন জেরুজালেমের প্রান্তরে। মৃত্যুর পণে খ্রীষ্ট কিনে নিয়েছেন পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোককে।

সাইকেল বাজলো। রেভারেণ্ড জানা, ফিরেছেন রূপাতলী হতে। তপন 'উইশ' করলো, হৃদয় সাইকেল হতে নামলেন। তিনি ভালোবাসেন তপনকে।

—'শুনেছেন কানাই বাগের কাণ্ড?' জিজ্ঞেস করলেন জানা।

—'মনসাদেবীকে মান্‌ছে?' তপন হাসলো।

—'মান্‌ছে। বলছে, জাত ছেড়েছে কিন্তু ধর্ম ছাড়ে নি। দুটোর মধ্যে যে কি তফাৎ সেটা ফাদার স্ট্রংকে বোঝাই কি করে?'

—'আপনি বুঝেছেন?' জিজ্ঞেস করলো তপন।

—'বড় কঠিন প্রশ্ন, ভেবে-চিন্তে উত্তর দিতে হবে।'

সাইকেলে উঠে পড়লেন জানা সাহেব।

জাত আর ধর্মের প্রভেদ? কি কথা! শুনলে হাসি পায়। মূর্খের কথা। কিন্তু বুকের মধ্যে কান পাতলে কি শুনবে হৃদয় জানা? তার শিক্ষিত বুদ্ধিযুক্ত মন কি বলবে?

শোনা যাবে কি সেখানেও এক গুন্‌-গুন্‌? জানা জাতে খ্রীষ্টান কিন্তু ধর্মে? তাকে ধারণ করে আছে, রক্ষা করছে মনুষ্যত্বের অবমাননা হতে, সেই মানব-ধর্মের কথা নয়। ধর্মমতের বিশ্বাস। সেখানে সে কি? দুর্গাপূজার ঢাকের শব্দে কি আজো একটি প্রণাম উঠতে চায় না সমস্ত বিরোধিতা ভেদ করে? মায়ের গুরুদেবকে দেখলে কেন টান-টান হয়ে দাঁড়াতে পারেন না? কেন ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করেন কোজাগরী-পূর্ণিমার সমারোহের?

লোভে পড়ে, দায়ে পড়ে, সমাজের পীড়নে অনেকে জাত

ছেড়েছে, কিন্তু ধর্ম ছাড়তে পারেনি। বুকের মধ্যে রাজত্ব করছে শিকড় ছড়িয়ে হিন্দুধর্ম। যাঁরা সত্যি-সত্যি খ্রীষ্টের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছেন, তাঁরা ধন্য। সত্যের সঙ্গে আর ব্যবহারের সঙ্গে তাঁদের আপোষ করে চলতে হয় না। কিন্তু সে কয়জন!

সাইকেল থামলো ঘরের দরজায়। অ্যাগ্‌নেস, সানি, স্বপ্না। দেয়ালে মহাকুমারী এবং ঈশ্বর পুত্রের ছবি, তাঁরাও মহান। ক্ষমা, প্রেম, আত্ম-ত্যাগে মহান।

এগিয়ে এলো অ্যাগ্‌নেস। লাবণ্য দিয়ে বানানো মুখ। সে মুখের দিকে চেয়ে থমকে গেলেন হৃদয়। নিজেকে মিথ্যাচারী বলে এতক্ষণ ছোট মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে ধর্মমতকে মনে-প্রাণে আপন বলে ভাবতে পারেন নি তার আচার্য হয়ে সবাইকে ঠকাচ্ছেন তিনি। এখন অ্যাগ্‌নেসের দিকে চেয়ে, নিমেষে উপলব্ধি করলেন হৃদয়; তিনি প্রবঞ্চনা করেন নি, কাউকে ঠকান নি, নিজেকেও না। অ্যাগ্‌নেসকে সত্যি ভালোবেসেছিলেন, নিজের ধর্ম আর সমাজ তাতে স্বীকৃতি দিতো না। হিন্দুধর্মে হৃদয়ের আকৃতির স্থান নেই! অ্যাগ্‌নেস তাকে নিয়ে গেছে খ্রীষ্টের অলটারের তলে, খ্রীষ্টকে ভালোবেসেছেন তিনি।

॥ ষোলো ॥

ঢেউ উঠলো। রমেশ উঁচুতে পৌঁছাতে পারে নি কিন্তু বিষ ছড়াতে কসুর করছে না। রুথকে দেখে হাসি টিটকারী চলছে সমানে। জো পেয়ে গেছে বুড়ীরা, বুড়োরা আর শিস-দেওয়া ছেলেগুলো। সমাজের যেখানে তাদের আদিম বাস ছিল, সেখানে এমন ঘটনা ঘটতো হরদম। সাহেবরা যিশু ভজিয়ে সভ্য করেছে, কিন্তু মনের টান যাবে কোথায়? তবে সব চলছে তপনকে লুকিয়ে। তপনবাবু বড় ভালো। উপকার করেন সর্বদা সবার। দোষ রুথের। কেমন মায়ের পেটে জন্ম! আবার ভড়ং কত! যেন মাদারের মতোই পুণ্যধতী। ধীবে-ধীরে চলে, কথা বলে চেপে-চেপে। কত যেন উঁচুতে ও শ্যামুয়েলের বোনের চেয়ে, নিবারণ মিস্ত্রীর বউয়ের চেয়ে। চ্যাংড়াগুলোও এতদিনের অপচয় উসুল করতে উঠে-পড়ে লেগেছে।

রুথ প্রথম কিছু বোঝে নি। লক্ষ্যই করে নি এসব ব্যাপার। তপনের ভালবাসা যেন দীঘির অতল জল। তার গভীরে গাহন করে গা জুড়িয়ে গেছে, মন ভরে গেছে রুথের। সুন্দর মুখে লাবণ্যের জোয়ার এসেছে, নীল চোখে সুখের আলো। মেয়েরা পড়া ভুলে দিদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—'দেখেছিস ভাই! রুথদি যেন ঠিক মেরী-মা।'

—'হ্যাঁ, ঠিক মাথার চারদিক ঘিরে "হেলো" বেরুচ্ছে।'

উষা একটু বাহাদুরি করলো—'ঠিক যেন জোয়ান অব আর্ক।'

—'কী অলক্ষুণে কথা!' কিলকিল করে উঠলো মেয়েরা।

—'অলক্ষুণে কথা? জোয়ান অব আর্ক সেণ্ট না?' উষা তর্ক করলো।

—'সেণ্ট না ?' ভেংচে উঠলো আশালতা।

—'পুড়িয়ে মেরেছিল কাকে ?'

এমিলি রফা করলো—'বরঞ্চ বল ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।'

সবার পছন্দ হলো এবার। খুশী হলো সবাই।

—'চতুর্থ পিরিয়ড রুথদির, পড়া শিখেছিস ?'

—'ওরে বাবা! আজ জিরাণ্ড আর ভারবেল নাউন পড়া। এই হেলী, তোর পড়া শেখা হয়েছে ? না হয়তো বল, এমিলি বুঝিয়ে দেবে।'

—'সবাই পড়া পারলে রুথদি কী যে খুশী হবেন। তারপর গল্প বলবেন। হিন্দুদের দেবতার গল্প—সাবিত্রীর গল্প।'

—'জানো ভাই'—, গিরিবালা ফিস্‌ফিস করে বললো, 'হিন্দুদের দেবতারা, আমাদেরো দেবতা। আমাদেরো ভক্তি দিতে হয় সাবিত্রীকে। আমাদের বাড়ী সাবিত্রীর বই আছে। আমার মা পড়েন। মুখস্থ আছে আমার, শুনবি একটু ?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই গিরিবালা আরম্ভ করলো—

"'সাবিত্রীব মুখে শুনি
এতেক ভারতী।
পবম সন্তুষ্ট হযে
কহে মৃত্যুপতি॥"

—'এই চুপ চুপ! মাদার—

রুথ সুখেই ছিল। ক্রমে সব বুঝলো। প্রথম বিরক্ত হলো, উপেক্ষা করতে চাইলো সব। তারপব গ্লানিতে ভরে গেল তার অন্তর। পথে বের হওয়া প্রায় ছেড়েই দিলো, শুকিয়ে উঠলো মেয়ে। কনক আধা-পাগল তো ছিলই, রুথের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে পুরো-পাগল হয়ে উঠলো এবার। নিজেকে ছিঁড়লো -কুটলো সে। কেন, কেন কনক এমন কাজ করেছিল! কেন

নদীতে ডুবে মরেনি মা হবার আগে! জোসেফের মতো ঠাণ্ডা মানুষও বিচলিত হয়ে উঠলো। রুথকে সে স্নেহ করে। সে রুথের বি-পিতা। রুথের প্রতি তার কর্তব্য আছে না? সোজা মানুষ জোসেফ ভাবলো—রুথকে বিয়ে করতে তপনের বাধা কোথায়? ধর্ম? তা হিন্দু আছে, না-হয় খ্রীষ্টান হবে। সেও তো একটা ধর্মই বটে। জানা সাহেব হন নি খ্রীষ্টান? সে নিজে বিয়ে করে নি কনককে? কত ভয় দেখিয়েছিল সবাই, কিন্তু দেখ কেমন মেজাজ-পত্তর ঠাণ্ডা রেখে ঘরকন্না করছে কনক। খুব ভালো ওয়াইফ! আর রুথ তো স্বর্গের দেবী!

সুতরাং রবিবারের সকালে চার্চের পর ধোয়া কামিজ আর ধুতি প'রে জোসেফ গিয়ে উপস্থিত হলো তপনের বাড়ী। তপন তখন বিলুর ডালিয়ার বেড পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। কাছে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালো জোসেফ।

—'এসো এসো, জোসেফ! কি মনে করে?'

—'আজ্ঞে, একটা প্রাইভেট কথা আছে।'

—'প্রাইভেট'কথা?'

আশ্চর্য হলো তপন। গন্ধরাজের ঝোপের কাছে বেঞ্চিতে বসলো।

—'বোসো, জোসেফ। আরে, বোসো বোসো। বল এবার তোমার প্রাইভেট কথা।'

—'আজ্ঞে, রুথের বড় বিপদ হয়েছে।'

—'বিপদ? কী বিপদ?' একেবারে উঠে দাঁড়ালো তপন। অবচেতন মন হতে প্রথম ভয়ের কথাটাই বেরিয়ে এলো —'ডি'সিলভা—'

—'আজ্ঞে, না না। সে-সব কিছু নয়। সবাই তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে। যা-তা বলছে, থুক দিচ্ছে।'

সম্ভাব্য সব অভিব্যক্তিতে বিস্তৃত করতে চেষ্টা করলো জোসেফ তার বক্তব্য। তপন বসে পড়লো। ধীরে ধীরে একটু একটু করে সব শুনলো। বুঝলো কেন রুথকে আর দেখা যায় না ঝিলের পাড়ে, নদীর ধারে, তপনের বাড়ীতে।

জোসেফ চলে যাবার পর অনেকক্ষণ—বহুক্ষণ বসে রইলো তপন সেই এক জায়গায়। পুরুষের সমস্ত অভিমানে তার মন পূর্ণ হয়ে গেল। নিজেকে বার-বার ধিক্কার দিল সে। তাকে ভালবেসে রুথ লাঞ্ছিত হচ্ছে, সেই প্রিয় মুখখানি মলিন হয়ে গেছে বেদনায়, আর তপন তার সব গর্ব, সব আভিজাত্য নিয়ে বসে আছে সুন্দর! কি করবে? কি করতে পারে তপন?

—'তপু! তপু!' মায়ের গলা শোনা গেল। আশ্রম হতে ফিরেছেন, মুখে শুচিস্নিগ্ধ আভা। লাল পথটি বেয়ে এসে দাঁড়ালেন ছেলের কাছে।

—'সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, স্নান করিস নি এখনো?'

মা থমকে গেলেন ছেলের দিকে চেয়ে। তপনের চোখ টক্‌টকে লাল, কপালের শিরা ফেটে পড়ছে। তপন একবার তাকালো মায়ের দিকে, তারপর উঠে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

সময় কি করে কাটলো—তপন বলতে পারে না।

দুপুরের বিশ্রামে বাড়ী নীরব হলে মা এসে ঢুকলেন ঘরে। তাঁর মুখও বিবর্ণ।

তপন টেবিলের উপর মুখ গুঁজে বসে ছিল, মা এসে মাথায় হাত দিলেন।

—'কি হয়েছে বাবা?'

—'কিছু হয় নি।' তপন মাথা নাড়লো।

—'তপু! তপু! এরি মধ্যে এত বড় হয়ে গেলি? আমাকে আর একটুও দরকার নেই তোর?'

মায়ের চোখে জল এলো।

তপন মাথা তুললো। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো মাকে। —'মা ! মা !'

ছেলেকে বুকে চেপে মনে পড়লো মায়ের আগের কথা। বারো বছরের তপু বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে এক ঘুষিতে ভেঙেছিল স্কুলের লাইব্রেরী-ঘরের দরজার কাঁচ। হেডমাস্টার মশাই জানতে পারেন নি, দোষী কে। কল্পনাও করেন নি তপন করতে পারে এমন কাজ। তিনি স্কুলসুদ্ধ ফাইন করে দিয়েছিলেন। সেদিন তপন এমনি করেই বুকে মুখ লুকিয়ে শুধু 'মা' বলে ডেকে তার সব কথা বুঝিয়েছিল মাকে। মায়ের কথামতো হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে দোষ স্বীকার করে শাস্তি নিতে গিয়েছিল। নগেনবাবু শাস্তি তো দেন নি, উল্টে ছেলেদের মিটিং ডেকে তপনের সত্যবাদিতা আর সাহসের প্রশংসা করেছিলেন কত। 'সমাজ-হেডমাস্টার' তো নগেনবাবুর মতো নয়। সে যে নির্মম, হৃদয়হীন।

মা বললেন—'আমি সব বুঝেছি তপু, সব জানি আমি।'

—'জান ? কিছু জাননা।'

দরজা বন্ধ করলো তপন। বললো রুথের লাঞ্ছনার কথা, আর জোসেফ যা ভাবতেও পারে না, যে ভয় কেবল কনককে পাগল করেছিল—তাও বললো। মাদার যখন এসব জানবেন, বিশ্বাস করবেন বিনাদ্বিধায় সব। বাঙালীদের চরিত্রের উপর একবিন্দু আস্থাও নেই মিশনারীদের। একদিনের জন্যও রুথ মিশনে আশ্রয় পাবে না। মিশনের আশ্রয় গেলে অসহায় রুথকে শকুনের মতো ঘিরে ধরবে ডি'সিলভাদের দল। এমন অনেকবার হয়েছে। সুশ্রী বোকা মেয়েগুলোকে ফুসলে ভোগ করে এইসব জমিদারেরা চুপে-চাপে। একদিন ফাদার সব জেনে, নাম কেটে দেন চার্চের খাতা হতে। তখন তাদের নিয়ে চলে উন্মত্ত লোফালুফি—তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় নর্দমায়। যে-সব নীল

চোখ আর কটা চুলের ছেলেমেয়ে পথে-পথে ভিক্ষা করে তারাই সাক্ষী এইসব অত্যাচারের।

রুথের বিপদ সবচেয়ে বেশী। সে সুন্দরী। তার কোনো গোত্র নেই। এক মিশনের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে—নয়তো কবে তাকে লুট করে নিয়ে যেতো ডি'সিলভা, হামফ্রিদের পাইক, —রাজামিঞার বরকন্দাজ।

সকালে মা খাবার দিচ্ছেন। বিলু চমকে গেল মাকে দেখে। তার এমন সুন্দর মা, এ কী হয়ে গেছে এক রাত্তিরে! খাবার ফেলে ঝাপটে ধরলো বিলু মাকে।—'নিশ্চয় কলিক্-পেন হয়েছে। মা!'

—'না না, কিছু হয় নি।'

—'তবে? তবে এমন দেখাচ্ছে কেন? চোখ বসে গেছে। বল বল কি হয়েছে?'

মহা হাঙ্গামা বাধালো বিলু। এক্ষুণি শাশুড়ী শুনবেন, আর কেঁদে-কেটে নিজের মরণ-কামনায় অস্থির হয়ে উঠবেন।

—'চুপ, বিলু! এক্ষুণি তপু উঠে পড়বে। [illegible] রাতে একটুও ঘুমোয় নি সে।'

—'ঘুমোয় নি মেজদা? কাল ভাতও খায় নি? কিছু খায় নি মেজদা? আমায় কেন বলছো না কিছু?'

—'তুই ছেলেমানুষ।'

—'ছেলেমানুষ? ষোলো বছর পেরিয়েছি না আমি?

তপনের ঘরের দরজা খুলে গেল। বারান্দা ঘুরে তপন ঢুকলো স্নানের ঘরে। মা স্থাণুর মতো ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন কাল রাত তিনটে পর্যন্ত ছট্‌ফট করেছে তপু। মা এসে তাকে নিয়ে শুয়েছেন। বলেছেন, 'তুই শান্ত হ। ছাখ্ আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

ছোটছেলের মতো মায়ের কথা বিশ্বাস ক'রে ছাব্বিশ বছরের শক্ত তপু ঘুমিয়ে পড়েছিল। মায়ের চোখে কিন্তু ঘুম ছিল না। ভোরের আলোয় তিনি দেখেছেন তপুর আয়নার মতো কপালে সূক্ষ্ম রেখা! শীর্ণ হয়ে গেছে ছেলে। মা কি করবেন? কেমন করে সমাধান করবেন এই জীবন-মরণ-সমস্যার? আজ কোথায় তিনি! কোথায় সুমন! সে এখানে থাকলে নিশ্চয় একটা উপায় বের করতো। সুমন ভয় জানে না, মন ঠিক করতে এক মিনিটও দেরী হয় না তার।

সামনে বসে বিলু। ষোলো বছরের চিকন শ্যামল ছেলে। বিলু তার ভাইদের মতো চওড়া নয়। মায়ের বেতের মতো শরীরের উত্তরাধিকারী সে। তারও কত সাহস! কত বুদ্ধি! তবু তো এখনো ছোট। ভার বইবার, চিন্তা করবার মতো বয়স তো হয় নি তার।

নিরালা দুপুরে মাকে টিপে-টিপে বিলু সব কথা বার করলো। মাও হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, নয়তো সহজে ভেঙে পড়বার মেয়ে তিনি নন। বিলু শুনলো। গম্ভীর হয়ে গেল। মুহূর্তে সে বড় হয়ে গেল। সে যেন আর বিলু নয়। সে যেন সুমন—বাবার প্রতিনিধি। জ্বলজ্বল করে উঠলো তার চোখ।

—'মা শোনো! রুথদিকে তো তুমি ভালবাস। ভালবাস না?'

হ্যাঁ, মা ভালবাসেন। খুবই বাসেন।

—'ব্যস্, তবেই সব গোল মিটে গেল।'

এত দুঃখেও মায়ের হাসি এলো।

—'হ্যাঁরে পাগলা! আমি রুথকে ভালবাসলেই এই সাংঘাতিক সমস্যার সমাধান হবে?'

—'হবে, হবে। আলবৎ হবে। মেজদা বিয়ে করবে রুথদিকে, —আমরাও ভালবাসি যাকে।'

—'বিয়ে করবে।'

মা যে-কথা ভেবে মরে যাচ্ছিলেন, বিলু সে-কথা উচ্চারণ করলো, 'হ্যাঁ, করবে বিয়ে।'

—'তপু খ্রীষ্টান হবে? আর রুথ যে কনকের মেয়ে!'

—'মা! মা!' মাকে থামালো বিলু।—'শকুন্তলা কার মেয়ে ছিল? মৎস্যগন্ধা? তাঁরা ভারতবর্ষের রাণী হয় নি? আর মেজদার খ্রীষ্টান হবার দরকারটা কি? জানো না আজকাল আইনে বিয়ে হয়? সেই আদিত্য গাঙ্গুলীর মেয়ে রমাদি বিয়ে করেছে মুসলমানকে। যে যাঁর ধর্মে আছে। বিয়ে হবে রেজেষ্ট্রি-অফিসে গিয়ে মেজদার।'

এমন জোর দিয়ে কথাটা বললো বিলু যে, মা কেবল ছোট মেয়েটির মতো আবৃত্তি করলেন—'রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করবে তপন!'

—'হ্যাঁ, করবে। তুমি সব ব্যবস্থা করো। বুঝিয়ে বলো, কলকাতা গিয়ে বিয়ে হবে। আমি কিন্তু সঙ্গে যাবো, মা, আর একটা কুকুর কিনবো।'

বিলু আবার ছোট বিলু হয়ে গেল। তু'লে নিল হকি-স্টিক, ছুটলো পুলিস-লাইনের দিকে।

॥ সতেরো ॥

ক্রমে ক্রমে মা ধাতস্থ হলেন। মনের মধ্যে মেনে নিলেন ভবিতব্যের অমোঘ বিধান। সুযোগ বুঝে তপুর কাছে তুললেন বিয়ের কথা। তপন এমন জোরে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলো যে, মাকে থেমে যেতে হলো। কিন্তু ছেলের মুখের দিকে চেয়ে আবার তুললেন কথা। এবার তপন মুখপাতেই মাকে থামিয়ে দিলো না। খানিকটা শোনার পর বললো,—'তারপর এ সহরে মুখ দেখাতে পারবে ? সবাই যখন বাবার নাম করে নানা বিন্যাসে টিটকারী দেবে তখন সহ্য হবে ? দলনীকে আর পাঠাবে না শ্বশুর-বাড়ী হতে। দাদা, বিলুর বিয়ে নিয়ে গোলমাল হবে ; সমাজে থাকবে একঘরে হয়ে। এসব ভেবেছে ?'

ভেবেছেন। মা সব ভেবেছেন বার বার। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কই !

উপায়ের কথাও বিলুই একদিন বললো,—'এঃ ! এই বাজে পচা সহরের চিন্তা তো ভারি ! দাদা কবে আসবে তার কিছু ঠিক নেই। আর আমি বড় হয়ে বিয়ে করবো নাকি ? আমার আবিষ্কার-টাবিষ্কার সব তাহলে যাবে না ! আর যদি বা করি—', একটু ভেবে বললো বিলু,—'মেমসাহেব—মেরী কুরীর মতো মেয়ে বিয়ে করবো। তুমি কুচবিহারে চিঠি লেখ মিনুমামাকে। কবে হতেই তো তিনি মেজদাকে যাবার জন্য বলছেন। মেজদা চলে যাবে সেখানে রুথদিকে নিয়ে ; টাকা পাঠাবে, আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস্‌সি. পড়বো।...বাঃ, সুন্দর হয়েছে।'

শেষের কথাটা বললো চন্দ্রমল্লিকার যে কলমটা কাটা হলো সেটা লক্ষ্য করে।

মা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন। এসব কি তাঁর সবচেয়ে ছোট, দুষ্টু বিলু বলছে, না তিনি স্বর্গ হতে বললেন বিলুর মুখ দিয়ে ?

মায়ের খুড়তুতো ভাই মণীন্দ্র ঘোষাল গিয়েছিলেন বিলেতে। বিয়ে করেছেন ব্রাহ্ম মেয়ে। তাঁর জাত নেই। কুচবিহারে তিনি জজ। অনেক তাঁর প্রতিপত্তি, ক্ষমতা। বহুবার তপনকে কুচবিহার ডেকেছেন—ভালো কাজ আছে। তপনদের গোঁড়া পরিবার। মা ভয় পেয়েছেন। তপনেরও ইচ্ছা হয় নি, তাই কান পাতে নি সে মণিমামার ডাকে।

এবার কান দেবার সময় হলো। মা রাজী করালেন তপনকে। মাঝামাঝি রকম রফা হওয়াতে তপন রাজী হলো। নিজের সঙ্গে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়েও পড়েছিল সে। ভাইকে চিঠি দিলেন মা। সব কথা বিবৃত করেই লিখলেন চিঠি।

দশদিনের মাথায় উত্তর এলো। মহা খুশী ঘোষাল। চাকরির ভাবনা নেই, আর কলকাতায় বিয়ে হবে না। সমারোহ করে বিয়ে হবে কুচবিহারে, ছেলের মামী বরণডালা সাজাচ্ছে। অনেক-দিন পরে তপন টমকে নিয়ে খেলা করলো, খেপালো মুখ্যিকে।

রুথকে বলতে হবে। ফাদার এবং মাদারকেও জানাতে হবে সব। তপনই বলবে তাঁদের, কিন্তু রুথকে জানাবেন মা নিজে। মুখ্যির সঙ্গে শাশুড়ীকে পাঠালেন মা কালী-কীর্তন শুনতে। রমণী গেল রুথকে আনতে।

—'হেই, দিদি! একবার মোদের ঘরে চল তো।'

—'কেন রমণীদাদু ?'

—'মায়ের বড্ড অসুখ করেছে যে।'

—'অসুখ ? মায়ের ?' উতলা হলো রুথ। কতদিন কোনো খবর নেয় নি, দেখে নি মাকে। তপনকেও কদাচিৎ দেখেছে স্কুলের মাঠে।

—'কী অসুখ হয়েছে মায়ের ?'

—'আমি বোকা মানুষ। ডাক্তারও নই, বদ্যিও নই। ক্যেমনে জানবো কী অসুখ ? মা বললো—মোর বড্ড অসুখ, রমণী, রুথকে নে'স গে। আমি চলে এনু—ব্যস্।'

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লো রুথ।

দরজার সামনেই মা। হাসিমুখ।

—'কী অসুখ হয়েছে মা ?'

প্রণাম করলো রুথ। হাত ধরে ঘরে নিয়ে যেতে-যেতে মা উত্তর দিলেন,—'অসুখ না করলে দুষ্টু মেয়ে আসে না যে, তাইতো খুব অসুখ হতে হলো আমার।'

রুথকে পাশে বসালেন মা।

—'অনেক কথা আছে। তার আগে—'

আঁচল খুলে মা বের করলেন সীতাহার,—প্রথম উপহার স্বামীর। পরালেন রুথের গলায়। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো রুথ। মা তাকে বুকে টেনে নিলেন। কত কথা, কত চোখের জল !

তারপর উঠলেম মা,—'একটু বোসো, আসছি আমি।'

মায়ের পায়ের শব্দ মিলাবার আগেই পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো তপন। দুই সবল বাহুর কঠিন আশ্লেষে ধরা পড়লো রুথ। থর্থর করে কাঁপতে লাগলো ভীরু ওষ্ঠাধর। সরে যাবার চেষ্টা করলো রুথ, পারলো না। এমনি চেষ্টা করেছিলেন হিমালয়-দুহিতা উমা, —পারেন নি যেতে—ন যযৌ ন তস্থৌ।

সন্ধ্যার পর রুথকে তপন পৌঁছে দিতে গেল মিশন-বাড়ীতে রুথ আপত্তি করেছিল। মা শোনেন নি। কেন যাবে না তপন ? আর ভয় কি লোকের কথায় ? দু'সপ্তাহের মধ্যেই তো চলে যাচ্ছে তারা।

রুথকে নিয়ে তপন বেরুলো, মা চেয়ে রইলেন। তিনি জানেন দু'সপ্তাহ পর তপন যাবে, রুথ যাবে। মা যাবেন না। যেতে

পারবেন না স্বামীর ভিটার স্বর্গ ছেড়ে। একটি ছেলে নিয়েছে দেশ, আর একটিকে নিলো প্রেম। বাকী রইলো বিলু। বিলুকেও হয়তো একদিন ডালি দিতে হবে তার দুঃসাহসের পায়ে।

একটি সপ্তাহ কাটলো। কুঁড়ি ফুটে হলো ফুল, লনের ছাঁটা ঘাস বেড়ে সবুজ করলো মাঠ। বড় সুন্দর এই একটি সপ্তাহ। বাইশ বছরের জীবনে এত সুখ পৃথিবীতে আছে বলে টের পায় নি রুথ। কত অভিনন্দন! কত শুভ কামনা! ফাদার দিলেন মেয়ে-ঘড়ি, মাদারের উপহার—সরু চেনে মুক্তা-বসানো সোনার ক্রশ। বোর্ডিং-এর মেয়েদের মুখ বিষণ্ণ, তবু তারাও চাঁদা তুলছে, বেনারসী শাড়ি দেবে রুথদিকে। কুচবিহার যেতে বাকি আর একসপ্তাহ। জন্মভূমিতে মোটে আর একটি সপ্তাহ থাকবে রুথ। তারপর একেবারে চলে যাবে। আর কি ফিরবে না এইখানে? কে জানে কি আছে ভবিষ্যতের পাতায়।

ঠিক হয়েছে শেষের এই সপ্তাহটি রুথ কনকের কাছে থাকবে। অনেক চেষ্টা ক'রে, মাদারকে ধরে রুথকে রাজী করিয়াছে কনক। একটি সপ্তাহ মেয়েকে নিজের কাছে রাখবে; খাওয়াবে, করবে আদর-যত্ন। গয়না গাড়ি—কত কি-ই তো সে দিতে পারতো রুথকে। কিন্তু কঠিন রুথের প্রতিজ্ঞা,—সে কিছু নেবে না। কনক বলছে না কিছু। দেখা যাবে নেয় কিনা! কত প্রতিজ্ঞাই রক্তের জোরে করে মানুষ, তারপর সব ভেসে যায়। কনকের চেয়েও বাহাদুর কনকের মেয়ে। হবে না? সাহেবের রক্ত যে নাড়ীতে। কেমন ঘায়েল করেছে তপনকে। হিঁদু! বামুন! মুখের দিকেই চায় না। আর এখন? কে জানে ক'মাস হয়েছে! আরে, দাইগিরি করে হাড় পাকলো কনকের, তাকে তুই, সেদিনের মেয়ে—ঠকাবি? যখন দেখেছে চোখে কালি তখনি তো ধরতো। কিন্তু এমনি ঢং ধরে ছিল রুথ যে, কনকের পাগল হবার জো। হাতে-নাতে অবশ্য ধরতে পারছে না কনক, প্রমাণ-পত্তর নেই তো। কিন্তু আন্দাজে

ঠিক বুঝেছে ও ছাড়া আর কিছুতে জব্দ হবার মানুষ নয় তপন চৌধুরী।

দুঃখ কেবল, পাড়াপড়শী জানলো না পাত্র কে। বিয়ের আগে পাত্রের সম্বন্ধে কিছু জানানো হবে না, ফাদারের কড়া নিষেধ। সবাই শুনেছে কলকাতার এক বন্ধুর সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্ট হয়ে আছে রুথের অনেক আগে হতে। এখন সেখানে গিয়ে বিয়ে হবে। রুথকে নিয়ে যাবেন রেভারেণ্ড জানা। ঠিক হয়েছে বিয়ের আগে পর্যন্ত তাঁরই হেপাজতে থাকবে রুথ। যা হয় হোক। মেয়ে সুখে, আনন্দে থাক্‌, এইতো চায় কনক—কেবল ইচ্ছা করে বাচ্চাটা তার হাতে জন্মাক। কত মেয়েকে খালাস করেছে কনক, আর রুথ নিজের মেয়ে! রুথ কোন কথা রাখবে না। যে গোঁয়ার! একেবারে সাহেবী ধাত। বলবে কনক তপনকে। বলবে—মেয়েদের এটা মহা বিপদের সময়। কনকের হাতে থাকলে ভরসা অনেক।

বাড়ীঘর সাজাচ্ছে কনক। সাজাচ্ছে নিজেকেও—যাতে তপনের চোখে তাব আভিজাত্য বাড়ে। লিপস্টিক, স্লিপার আর পিছনে-কুঁচি সামনে-আঁচল শাড়ি—সব ভালো ভালো, তুলে রাখা শাড়ি। জোসেফ মহা খুশী। খুব সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে কনককে, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের বড় আয়ার চেয়েও।

রুথ কিন্তু লক্ষ্য করে নি কোনো পরিবর্তন, সে নিজের মধ্যে মগ্ন।

দিন গেল। কাল চলে যাবে তপন। তারপর জানা সাহেবের সঙ্গে রুথ। সন্ধ্যায় এল তপন কনকের বাড়ী। ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাবার আগে দেখা করা দরকার—রুথকে বলতে হবে দু'একটা কথা।

রুথ ঘরে বসে ছিল। টেবিলে মোমবাতির আলো। লম্বা বাঁশের ফুলদানিতে অশোকগুচ্ছ। পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠছে চন্দন-সুবাসিত গুগ্‌গুলের স্টিক হতে। সব মিলে এমন একটা

মাধুরী যে, তপনের মন পুলকে ভরে গেল। রুথের হাত মুঠি ভরে নিয়ে বললো কিন্তু কাজেরই কথা,—'তুমি যাবার আগে মায়ের কাছে গিয়ে, সব ভালো করে বুঝে নিয়ো। আমি কলকাতা গিয়েই বাসা ঠিক করবো।'

কনক মস্তবড় টেবিল-ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কথা শেষ হোল না তপনের। কনক আলো রাখলো টেবিলের ওপর, নিজে বসলো চৌকি টেনে তপনের মুখোমুখি। সব সৌন্দর্য ছিঁড়ে-খুড়ে বীভৎস হয়ে উঠলো মুহূর্তে। রুথের হাঁত ছেড়ে দিলো তপন ; রুথ তাকালো জানলার বাইরে।

—'শুনুন, তপনবাবু!'

তপন শিউরে চাইলো কনকের দিকে। কনক পাতাকেটে এলো খোঁপা বেঁধেছে। কপালে ঝক্‌মক করছে সোনা-পোকার টিপ। কর্কশ, রুক্ষ কণ্ঠস্বর।

—'শুনুন, তপনবাবু! রুথ তো আমায় গ্রাহ্যই করে না, কিন্তু মা তো আমি, কথা না বলেও থাকতে পারলাম কই! কুড়ি-পেরুনো মেয়েদের বিপদ ঘটে এ-সময়ে সাবধান না হলে। কত দেরী আছে তা তো মেয়ে আমায় কিছুই বলবে না। না বলুক। আমার ইচ্ছে, বাচ্চাটা হবার সময় আমি যাবো আপনাদের ওখানে।'

—'কী বলছো তুমি?' হতবুদ্ধি তপন বললো।

চোখ টিপে মুখঝামটা দিল কনক:—'বলছি, যেটা পেটে এসেছে সেটাও বেঁচে থাক্‌, রুথেরও যেন কোনো বিপদ না হয়। বুঝলেন? আপনারা শিক্ষা পেয়েছেন, আপনাদের মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বানাতে তো আমি জানি না। যা ভালো বুঝলাম, বল্‌লাম স্পষ্টকথায়। এখন আপনার ইচ্ছা—রুথের মর্জি!'

খালি পায়ে নৈবেদ্য নিয়ে মন্দিরে যাবার পথে পায়ের তলায় অমেধ্য অশুচি স্পর্শ হলে যেমন লাগে, তেমনি একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল তপনের সমস্ত শরীর।

—'এখনো কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। বিয়েটা সারছেন তাড়াতাড়ি—ভালোই। এরপর ঠিক বেরিয়ে পড়তো, আমি সব জানি তো লক্ষণ। যাহোক, আমাকে নিয়ে গেলে, আপনারই সুবিধে। খরচ নেই, বিপদের আশঙ্কাও কম।'

শেষ কথাটা দরজার কাছ হতে ছুঁড়ে দিয়ে, বেরিয়ে গেল কনক ঘর হতে।

রুথ উঠে দাঁড়িয়েছে। বিস্ফারিত তার দুই চোখ। তপন বসে আছে মাথা হেঁট করে।

একটু সময় গেল। উঠে দাঁড়ালো তপন। একটা নিশ্বাস পড়লো কি পড়লো না,—চলে গেল ঘর ছেড়ে।

পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে, যখন বাড়ী ফিরলো তপন তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। মহা হুলস্থুল বাড়ীতে। ঠাকুমা উঠানে পড়ে গেছেন পা পিছলে, হয়তো কোমর ভেঙেছে। ডাক্তার ডেকে এনেছে বিলু। খুব ব্যথা—চীৎকার করছেন।

॥ আঠারো ॥

সারারাত রুথ সেই চেয়ারে বসে রইলো। কনককে সে একটা কথাও বলে নি। কনক প্রথম গজগজ করেছিল—'যা করি, মেয়ের ভালোর জন্যই করি। আমার আর কে আছে মেয়ে ছাড়া!' রুথ যে ফন্দি এঁটেছিল তা কনক বোঝে নি প্রথমে, তারপর কত খুশী হয়েছে এখন সব বুঝে। তা, তপনও লোক ভালো; এমন হ'লেও তো অনেকে রাজী হয় না বিয়ের কথায়, যদি তেমন জোরালো প্রমাণ না থাকে।

রুথ প্রতিবাদ করে নি কনকের কথার। চোখও তোলে নি। পাথরের মতো বসে ছিল। তার রকম-সকম দেখে ঘাবড়ে গিয়ে, একসময় থেমে গেল কনক।

না খাওয়া, না দাওয়া। সব পড়ে রইলো। কী সুন্দর মাছের মুড়োর কারি আর পুদিনার চাট্‌নী বানিয়েছিল কুসুমের মা! তা রুথ না খেলে, খাবার কি মুখে রোচে কনকের?

সারারাত রুথ ভাবলো। কি ভাবলো? এক নিমেষের জন্য তার দিকে চেয়ে ছিল তপন, তাতেই রুথ সব দেখে ফেলেছে। তপনের চোখ হতে হীরার দ্যুতি আর ঠিকরে পড়ছে না, কপালে রেখা, চোখের কোলে কালি, উঁচু হয়েছে কণ্ঠার হাড়। আর মুখ! সেই পরম আকাঙ্খিত মুখ কনকের বিষে নীল হয়ে গেছে। মনে পড়লো তপনের মায়ের নীল্‌চে কালো চুলে সাদার ছাপ। কত রোগা হয়ে গেছে বিলু!

কেন হয়েছে? কেন? রুথের জন্য। রুথ যে সর্বনাশ করেছে ওদের। জেনেশুনে অন্ধ সেজে বসে আছে রুথ।

তপনের যখন রক্তমোক্ষণ হচ্ছে, সে তখন ডগ্‌মগ করেছে খুশীতে। মনে পড়লো কতদিন আগের কথা—ঝিলে সদ্য সাঁতার কেটে উঠে এসেছে তপন। আঁট করে পরা ধুতি, তার উপর তোয়ালে জড়ানো। প্রশস্ত বুকের ওপর শুভ্র পৈতেটা জ্বলছে, জল ঝরছে সিক্ত শরীর বেয়ে, আর সূর্যের আলো ঠিকরে-ঠিকরে পড়ছে।

সেই প্রথম ভালবাসলো রুথ! বিকিয়ে দিলো তরুণ দেবতার মতো তপনের পায়ে নিজেকে। তখন ছিল বয়স কম। জানতো না ভালবাসা কাকে বলে, কেবল দেখতে ইচ্ছা হতো তপনকে। ছুটে-ছুটে যেতো বেলস্‌ পার্কে, ঝিলের ধারে, চাঁদমারির পাহাড়ে—যেখানে তপন খেলে, সাঁতার কাটে, টার্গেট প্র্যাক্‌টিস করে। তখন তো রুথ বুঝতো না তার ভালবাসার মাঝখানে রয়েছে জন্মের কলঙ্ক, ধর্মের বাধা। সবে তখন কুঁড়ি। সোনার কিরণ পাঠিয়ে তপন তাকে ফুটিয়ে দিলো।

সমস্ত পৃথিবী আলোয় ভরে গিয়েছিল। মনে হতো গান গেয়ে কথা বলে, নেচে-নেচে চলে। পড়ার ঘর, ছোট্ট টেবিল, বই, খাতা—সব তপনের ছোঁয়ায় অপরূপ হয়ে উঠলো। পড়া বোঝাতে তপন চাইতো তার দিকে, সেই দৃষ্টি ঠেকে রঙিন্‌ হতো রুথ। আঙুলের ছোঁয়ায় সমস্ত শরীরে বীণা বেজে উঠতো—জীবনের কোষে-কোষে মধুর সঞ্চার।

তারপর একদিন তপন চলে গেল। কনকের চীৎকার, প্রতিবেশীদের টীকা-টিপ্পনী খান্‌খান্‌ করে দিল মনের মাধুরী। সেদিন সারারাত ধরে কেঁদেছিল রুথ। এক রাতে কেঁদেছিল জীবনের সব কান্না। তার পরদিন সে অন্য রুথ হয়ে গেল। পরম দুঃখে চিনলো তার জীবনের চরম সত্যকে। যে ভালবাসা জেগেছিল সমস্ত হৃদয় ভরে, তাকে গোপন করলো শত কাজের পত্রপল্লবে। বি. এ. পড়াতে এলো তপন। ভয়ে সঙ্কুচিত

হয়েছিল রুথ। যেদিন খাবার দেখে অশুচি স্পর্শ এড়াতে টেবিল ছেড়ে উঠে গেছে তপন, সেদিন হতেই বড় ভয় রুথের। যদি তপন সব বুঝে ফেলে, দেখে ফেলে মনের কথা আর ভ্রূ কুঁচকে ওঠে তার অমেধ্য মানস-ভোজের আয়োজন দেখে! তবে? তবে কি করবে রুথ?

তপন পড়াতে এলো। তার পায়ের শব্দে, গলার স্বরে আবার উথাল-পাথাল হ'ল রুথের হৃদয়; কিন্তু নিজেকে কড়া শাসনে বাঁধলো সে। তুললো না চোখ, হাত রাখলো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তবু একদিন হঠাৎ মিলে গেল চোখে চোখ— আর তখনি বুকের সব চঞ্চলতা থেমে গেল। রুথ এক পলকে বুঝে নিলো—ব্যর্থ হয় নি সে। নষ্ট হয় নি তার ভালবাসার একটি ফুলও, প্রেমের ঝরণাধারায় স্নান করলো রুথ। মুছে গেল সব গ্লানি, যত দীনতা। দুটি তরুণ হৃদয়ের সোনালী রোদে, বাসন্তী বাতাসে পৃথিবী আর জীবন সুন্দর হয়ে উঠলো। যখনি তপন চোখ তুলেছে,—ঢল নেমেছে ভালবাসার। কথা বলেছে তারা। কত কথা! শেলীর ভালবাসা-বিবর্ণ-হৃদয়ের জবানবন্দী, কীট্‌স-এর সৌন্দর্য-আরতি, বায়রনের চাঞ্চল্য. ব্রাউনিং-এর গভীরতা—সব নিয়ে কথা বলেছে তারা। কেবল বলা হয় নি নিজেদের কোনো কথা। মনে পড়ে নি সে-কথা বলতে হবে। দেশ-বিদেশের কবিরা যে সে-সব কথা বলে গেছেন তাদের হ'য়ে!

আকাশ আর বাতাস ভরে রুথ আর তপনের কথাই তো শুধু। ঝাউয়ের শোঁ-শোঁ মাথা দোলানো. দুলে-দুলে নদীর ছলছলে ঢেউ। সেই হাওয়া, সেই ঢেউ কে? সে তো তপন! সে তো রুথ! সকাল-বিকেলের মন-কেমন-করা মধুর আলো, শেফালী-জুঁইয়ের ফোটা—তাদেরই ভালবাসা। তারপর সেই বি. এ. পাসের খবর-পাওয়া-দুপুরবেলা। নিঝুম লাল রাস্তা সূর্যের আলোয় সোনার পাতের মতো পড়ে ছিল; অশোকগাছ

ফুল ছিটিয়েছিল তার উপর। রুথ চলেছিল কোথায়? তপনের সঙ্গে দেখা হলো। প্রণাম করতে আনত হয়েছিল রুথ, তপন নেয় নি প্রণাম। তার অধরপুট হতে তুলে নিয়েছিল যৌবনের প্রথম অর্ঘ্য। অসহ্য দুঃখের পর কত সুখ!

আর আজ? তপন ছিল কোথায়! সম্মানে, শ্রদ্ধায় সবাই তাকে রেখেছিল দেবতার আসনে। সেই দুপুরবেলার সূর্যে রাহুর ছায়া পড়েছে। রাহু—রুথ নিজে। তপনের আর দীপ্তি নেই, নেই সেই উজ্জ্বলতার পরিমণ্ডল। সে জাতিচ্যুত, গোত্রচ্যুত—প্রায় ঐ ডি'সিলভাদের পর্যায়ভুক্ত। রুথের ভালবাসার কালিতে কালো হয়ে গেছে তপন, কালো হয়েছে তার পরিবার। মুখ লুকিয়ে, ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে সবাই। জলে-ডোবা মানুষের মতো নিশ্বাস টানলো রুথ। এ কী করতে বসেছে সে? কত স্বপ্নে, কত জাগরণের কল্পনায় রুথ নিজেকে রেখেছে তপনের পাশে, ধরা পড়েছে তার আশ্লেষে—ভেসে গেছে আনন্দের জোয়ারে। একবারও ভাবে নি—তাদের এক হওয়া মানেই নীচে নেমে আসা তপনের। নেমেই এসেছে তপন। কি মুখ কী হয়ে গেছে! বেরিয়ে গেলো,—সেই সতেজ পদক্ষেপ কই! যেন কত দুর্বল, কত ক্লান্ত।

এখনি জলে ডুবে মরতে পারে রুথ। কিন্তু নদীর সব জলেও মুছবে না তপনের কলঙ্ক। আরো তীব্র বিষ ছড়াবে কনক।

তাহলে? ভোর হয়ে গেছে। এক্ষুণি জেগে উঠবে বাড়ীর সবাই। পাছে কনকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায় সেই ভয়ে পালালো রুথ। কোথায় পালাবে রুথ? সে তো কাউকে চেনে না, কিছু চেনে না। কেবল জানে মিশন। মিশন। মাদার। ছুট্। ছুটলো রুথ পাগলের মতো। কেউ যেন তাকে এক্ষুণি ধরে ফেলবে সেই ভয়ে ছুটলো রুথ।

রবিবারের প্রথম ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং। জেন বেড়িয়ে

বেড়াচ্ছে বাগানে; শান্ত সমাহিত মুখ, পদ্মকোরকের মতো মুঠি-দুটি যুক্ত। পায়ে লুটিয়ে পড়লো রুথ।—'ও মাদার! সেভ মি।'

মাদার আশ্চর্য হলেন। শান্ত, সংবৃত মেয়ে রুথ। কখনো দেখেন নি তার উত্তেজনা।

—'কী ব্যাপার রুথ? সবাই কেমন? তপন? তপন ভালো? আজ তো তিনি কলকাতা যাচ্ছেন?'

—'না, না।' কাঁপতে কাঁপতে রুথ বললো।

—তাকে কলকাতা যেতে হবে না, আমি বিয়ে করতে পারবো না।'

—'বিয়ে করতে পারবে না?' মাদারের বিস্ময় সীমা ছাড়ালো।—'বাট্ হি ইজ এ পারফেক্ট জেণ্টলম্যান।'

—'কিন্তু আমি? আমি কী মাদার?' হাঁপাতে লাগলো রুথ।

চকিতে মাদার সব বুঝলেন। নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন রুথকে। জল খেতে দিলেন। জানালা খুলে হাওয়া আনলেন ঘরে।

অনেকক্ষণ পরে রুথ সামলে উঠলো, প্রকৃতিস্থ হলো।

—'এ বিয়ে হবে না, মাদার!'

—'কেন রুথ? কনক যাই হোক না কেন, তুমি তো বড় ভালো মেয়ে।'

—'মাদার, আমার নামের পদবীতে কোনো লিগ্যাল রাইট নেই।'

স্থির কণ্ঠে বললো রুথ। আর সে কাঁপছে না। স্থির হয়েছে মন, চিনেছে নিজেকে। কনক তার মা, উচ্ছৃঙ্খল ডি'সিলভা তার জন্মদাতা—কিন্তু রুথ উচ্ছৃঙ্খল হবে না। জন্মের কলঙ্কে কালো করবে না তার ভালবাসাকে। পণ্যা নারীর দুহিতা রুথ বরনারী হলো। যত নতুন বউ আসবে প্রেমের দীপ নিয়ে, তাঁদের শুচিস্নিগ্ধ আলোয় বিসর্জন দিলো নিজেকে।

সব শুনলেন মাদার। মেয়ে-মন দিয়ে বুঝলেন মেয়ের দুঃখ। মুচড়ে উঠলো বিস্মৃত ব্যথা। কতদিন? কতদিন হলো? ঠিক পনেরো বছর। হ্যামফ্রেডশায়ারে বাপের মস্তবড় জমিদারি। একমাত্র দুলালী জেন। মা নেই। অক্সফোর্ডের পড়া শেষ করে বাড়ী এলো। আঙুলে আংটি, পরিয়েছে রিচার্ড কলিন্স। এনগেজমেণ্ট অ্যানাউন্স করতে হবে। কিন্তু বাপ গা করছেন না মোটে। কী ব্যাপার? জেন প্রথম অপেক্ষা করলো, ক্ষুণ্ণ হলো, ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠলো। বাপ লক্ষ্য করছিলেন। এক রাতে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে মেয়েকে। বললেন—'কথা আছে, এবং সেটা একটু ডেলিকেট।'

পাইপটা ঠুকতে লাগলেন টেবিলে বাবা।

ডেলিকেট কথা? টাকা-পয়সার সম্বন্ধে বুঝি? আরক্ত হলো জেন।—কোনো দরকার নেই তার টাকার।

—না না, সেসব নয়।

—তবে? তবে কী?

—জেনের মাকে মনে পড়ে কি?

—বাঃ, মনে পড়েনা মাকে? কী সুন্দর সোনালী চুল ছিল মায়ের! ইটালি গিয়ে সমুদ্রে ডুবে গেলেন।

—না। সমুদ্রে ডোবে নি জেনের মা। পালিয়েছিল রিচার্ডের বাবা রেমণ্ড কলিন্সের সঙ্গে। উচিত ছিল ধরে এনে গুলী করা, কিন্তু জেনের কথা ভেবেই বাবা সেদিন থেমে গিয়েছিলেন। এখন ভেবে দেখুক জেন, রিচার্ডকে বিয়ে করবে কিনা।

পৃথিবীর সব রং জ্বলে গেল মুহূর্তে। সেদিন জেনও সারারাত কেঁদেছিল। তারপর ফিরিয়ে দিল আংটি। শত মিনতিতেও দেখা করে নি রিচার্ডের সঙ্গে। চলে গেলো কনভেণ্টে। সেখানে কাটলো তিন বছর—তারপর নিল ভেল। পবিত্র ব্রত! এলো ইণ্ডিয়ায়। এত বছর পরে ইংলণ্ড গিয়েছিল বাপের মৃত্যুসংবাদ

পেয়ে। নিছক কৌতূহলের বশে খোঁজ নিয়েছিল রিচার্ডের। রিচার্ড লণ্ডনে নেই। ইংলণ্ডেই নেই। চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া বা আফ্রিকা কোথায় যেন। যে পর্ব চুকে গেছে সেও আজ রুথের ব্যথায় জেগে উঠতে চায় বুকের মধ্যে। সামনে খ্রীষ্টের ক্রুশ-বিদ্ধ ছবি। সেখানে দাঁড়ালো জেন। মনে পড়লো মহাবাণী:

"If any man will come after me, let him take up his Cross daily, and follow me."

শান্তি আর স্থৈর্য ফিরে এলো মনে।

—'এখন কি করতে চাও?' রুথের মাথায় হাত রাখলেন মাদার। —'তপন কি মানবে তোমার এসব আপত্তি?'

মানবে না। শুনবে না। জানে রুথ। তপন ঝড়ের মতো উড়িয়ে দেবে সব বাধা, ভেসে যাবে রুথ তখন।

একবার ভাবলো সে—তবে তাই হোক। তপন এসে দস্যুর মতো লুণ্ঠন করুক তাকে। কিন্তু তক্ষুণি শিউরে উঠলো। বুকের মধ্যে কে বললো এমন কথা? এ তো রুথ নয়! এ যে কনকের বুদ্ধি, ডি'সিলভার রক্ত!

—'তপন মানবে না, মাদার! কিন্তু আমি মানাবো তাকে। আর কাউকে বিয়ে করবো।'

—'বিয়ে? কি আশ্চর্য! কাকে বিয়ে করবে?'

—'রমেশ মাস্টারকে।' কাঁপলো না রুথের গলা। লাল টুকটুকে মুখ। লাল হয়ে গেছে চোখের সাদাও, কপালে ঘাম। মাদার তাকালেন রুথের দিকে। এমন অবস্থায় এসেছে রুথ যে আত্মহত্যা করতে পারে অনায়াসে, আর সে প্রস্তাবই তো করছে প্রকারান্তরে।

—'অধীর হয়ো না, রুথ! রমেশ শীল কেবল পশু নয়। সে কুষ্টব্যাধি। ইচ্ছা করে তাকে জীবনে ডেকে এনো না। স্ত্রী মানে সন্তানের মা হওয়াও। রমেশ শীলের সন্তান গর্ভে ধরতে পারবে?'

ধীরে ধীরে বসে পড়লো রুথ।

—'আর যে কোনো উপায় নেই, মাদার।'

—'আছে। মুক্তির উপায়, সার্থক হবার উপায় আছে। যাও, প্রস্তুত হয়ে নাও। চল চার্চে যাই।'

ঘণ্টাখানেক পরে মাদারের সঙ্গে রুথ এসে চার্চে ঢুকলো। সার্ভিস তখন শেষ হয়ে গেছে। অলটারের বাঁ-পাশে পিয়ানোতে অ্যা[illegible]জানা গান ধরেছে—

"*Blessed be the Lord God of Israel : for he hath visited and redeemed his people. And hath raised up a mighty salvation for us : in the house of his servant David.*"

নতজানু হলো রুথ।

॥ উনিশ ॥

যেতে পারলো না তপন। ঠাকুমা সুস্থ না হলে যায় কি করে? গত সন্ধ্যার গ্লানি কাটে নি, কমেছে তার তীব্রতা। তবে সেই কদর্য অনুভূতি আর নেই। তপন তো জানে নিজের মানসিক দারিদ্র্য অতিক্রম করবার সাধ্যই নেই কনকের। কুৎসিত ধারণা যে তার সহজাত। রুথকে দেখতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু কনককে বাদ দিয়ে তাকে দেখা এখন সম্ভব নয়। মা ক্লান্তপায়ে এঘর-ওঘর করছেন। রুথ এলে সাহায্য হতো।

না না, ঘরের কাজে রুথ আর কি সাহায্য করবে? এই ঠাকুমার সম্বন্ধে কথা-টথা হতে পারতো।

হঠাৎ তপনের মনে হলো একঘণ্টা ধরে সে যা ভাবছে তার সঙ্গেই জড়িয়ে যাচ্ছে রুথ। ভারি আশ্চর্য! কি করে সে এমন অচ্ছেদ্য হলো জীবনের সঙ্গে?

—'কি রমণীদাদু?'

—'তোমার কাছে মিশনের পুলুস এসেছে।'

—'আবার? বলে দিয়েছি না—ও পুলিস নয়, চাপরাসী। কি চায়?'

—'কি চাইবে আবার? হাতে চিঠি। চাইলুম, তা দিল না, বলছে—পাইভেট।'

—'ও! ফাদার চিঠি লিখেছেন, হয়তো শুনেছেন, ঠাকুমার পড়ে যাবার কথা।'

তপন উঠে বাইরে এলো।

—'কি স্যামুয়েল?'

—'আজ্ঞে, ফাদারের চিঠি, স্যার।'

—'আচ্ছা একটু দাঁড়াও। উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি।'

কভারের সীল ভেঙে চিঠি পড়লো তপন। সুন্দর বিকেলের আলো ঘোলাটে হয়ে এলো, ঝিম্‌ঝিম করলো মাথা। আবার চিঠি পড়লো তপন—

রুথ চলে গেছে। চলে গেছে তিনটের স্টীমারে সহর ছেড়ে। গেছে সাঁওতাল পরগনার নতুন মিশনের কাজে। রেভারেণ্ড জানা সঙ্গে গেছেন পৌঁছে দিতে তাকে। সংসার করবে না রুথ। সংসারী হবেনা সে। তিন বছর 'নভিস' থাকবে, তারপর নেবে ভেল। রুথ উৎসর্গ করলো নিজেকে সেই ঈশ্বরপুত্রের সেবায়, যিনি একদা মানুষকে ভালবাসার অপরাধে জেরুজালেমের প্রান্তরে নিজের ক্রশ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাবার আগে, বার বার তপনের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে রুথ। ফাদারের আশা—তপন ব্রেভ বয়। পুরুষের মতোই আঘাত সহ্য করবে। রুথ যে-কাজে গেছে তা রুথেরই যোগ্য।

মাথা ঘুরে উঠলো। চোখে অন্ধকার ঘনালো। একটা আর্তশব্দ বেরিয়ে এলো গলা হতে।

মা ছুটে বাইরে এলেন।

—'কি হয়েছে? কি হয়েছে তপু? কার চিঠি?' ইংরেজী লেখা, মা যে পড়তে পারবেন না। —'কাকে জিজ্ঞেস করি? তপু, কথা বল। স্যামুয়েল, কার চিঠি এনেছো? রুথের?'

—'আজ্ঞে, না। ফাদারের চিঠি। রুথদিদি তো আজ তিনটের স্টীমারে জানা সাহেবের সঙ্গে সাঁওতাল পরগনা চলে গেছেন।'

—'সাঁওতাল পরগনা? কেন? কলকাতা যায় নি? আচ্ছা আচ্ছা—তুমি যাও।'

—'তপু, তপু!' ছেলেকে জোরে নাড়া দিলেন মা। টেনে আনলেন ঘরের মধ্যে।